দ্বিতীয় সংখ্যা // মার্চ-২০১৩

সিরিয়া : অতীত ও বর্তমান

মানুষ কেনো কুফরি করে?

রাসুল অবমাননা : হে মুসলিম! ঈমানী শক্তি অর্জন করো।

www.attibyean.tk // attibyean@gmail.com

সূচিপত্র

কুরআনে একটি মু'জিযা

মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আল্লাহ (সুব.) প্রত্যেক নবী-রাসুলকে কিছু না কিছু মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যাতে মানুষেরা নবী-রাসুলদের কথাগুলোকে সহজে বিশ্বাস করে মেনে নেয়। এটি অবশ্যই কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ (সুব.) এর নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ (সুব.) যখন যে নবী-রাসুলকে যে দায়িত্ব পেশ করার ক্ষমতা দেন সে ততটুকুই প্রকাশ করতে পারে, তাও আল্লাহ (সুব.) ইচ্ছাধীন। যেমনঃ মুসা (আ.) এর মু'জিযা ছিলো হাতের লাঠি ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে যাওয়া, দাউদ (আ.) এর মু'জিযা ছিলো হাতে লোহা নিলে মোমের মতো গলে যাওয়া, ঈসা (আ.) এর মু'জিযা ছিলো জন্মান্ধ লোকের চোখে হাত বুলালে চোখ ভালো হয়ে যাওয়া। আর আমাদের রাসুল (সা.) এর মু'জিযা হলো অন্যান্য মু'জিযার মধ্যে সবচেয়ে বড় মু'জিযা আল কুরআন। অন্যান্য নবী-রাসুলদের মু'জিযাগুলো তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আর আমাদের রাসুল (সা.) এর মু'জিযা 'আল কুরআন' ( ) এখনও পূর্বের মতো রয়েছে। এবং অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। একে কোনো বাতিল শক্তি ধ্বংস করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

('বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।' সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৪২)। আর বাতিল এতে কিভাবে অনুপ্রবেশ করবে, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ (সুব.) বলেছেন–

('নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।' সুরা হিজর, ১৫:৯)। এ কুরআন নাযিলের সূচনালগ্ন থেকেই নানা প্রকার বাতিল শক্তি এর শুভযাত্রা বাধাগ্রস্ত করতে সর্বাত্নক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি। আল্লাহ (সুব.) বলেন–

('তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।' সুরা সফ, ৬১:৮)। কাফির-মুশরিকরা এ কুরআন শ্রবণ করা থেকে জনগণকে বাঁধা প্রদান করতো এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময় হট্টগোল করার জন্য নির্দেশ করতো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

('আর কাফিররা বলে, 'তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শুনবে না এবং এর আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি করো, যেন তোমরা জয়ী হতে পার।' সুরা ফুসসিলাত, ৪১:২৬)। শুধু তাই না, তারা এই কুরআন সম্পর্কে জনগণের মনের ভেতরে সংশয় ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য বলতো যে 'এটা মুহাম্মদ (সা.) নিজে তৈরি করেছেন এবং তাকে অমুক (অনারব) ব্যক্তি এ ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে।' আল্লাহ (সুব.) তার জবাবে ইরশাদ করেছেন–

('আর আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, তাকে তো শিক্ষা দেয় একজন মানুষ, যার দিকে তারা ইঙ্গিত করছে, তার ভাষা হচ্ছে অনারবি। অথচ এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষা।' সুরা নাহল ১৬:১০৩)। আল্লাহ (সুব.) কাফির-মুশরিকদের অভিযোগের জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি মুহাম্মদ (সা.) এ কুরআন কারো সহযোগিতায় তৈরি করে থাকেন তাহলে তোমরাও এরকম একটি কুরআন তৈরি করো। কেননা তিনিও আরব তোমরাও আরব। প্রয়োজনে তোমরাও অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) বলেন–

('বলো, 'যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।' সুরা বনি ইসরাঈল, ১৭:৮৮)। এ আয়াতে এ কুরআনের মতো একটি কুরআন তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি আরো একটু সহজ করে দেয়া হয় এবং কুরআনের দশটি সুরার মতো দশটি সুরা তৈরি করতে বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

(নাকি তারা বলে, 'সে এটা

মনগড়াভাবে করেছে'? বলো, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। সুরা হুদ, ১১:১৩)। যখন তারা এতেও অপারগ হলো তখন তাদেরকে কুরআনের সূরার মতো একটি সুরা তৈরী করতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

(আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাজিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মতো একটি সুরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সুরা বাকারা, ২:২৩)। এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াতে বলা হয়েছে–

(নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বলো, 'তবে তোমরা তার মতো একটি সুরা (বানিয়ে) নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। সুরা ইউনুস, ১০:৩৮)।

কিন্তু কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ গ্রহণ করতে পারেনি। তাইতো ডক্টর মরিস বুকাইলী কুরআনের ভুল খুঁজে বের করার জন্য কুরআন গবেষণা করে মন্তব্য করেছেন, 'আমি কুরআনের কোনো ভুলতো ধরার সুযোগ পাইনি, বরং কুরআন আমার জীবনের পদে পদে যে ভুলগুলো ছিলো তা ধরিয়ে দিয়েছে।'

কুরআন একটি আলো

পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, (সুরা সফ, ৬১:৮)। এ আয়াতে নূর বলতে কুরআন মাজিদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কুরআন হলো একটি নূর (আলো)। আল্লাহ (সুব.) মানুষকে চক্ষু দিয়েছেন দেখার জন্য। কিন্তু চোখ থাকলেই কি দেখা যায়? না, চোখ দিয়ে দেখতে হলে অবশ্যই আলোর প্রয়োজন। সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, তারকার আলো, মোমবাতির আলো, বিদ্যুতের আলো কিংবা জোনাকি পোকার আলো হলেও প্রয়োজন। চোখের পাওয়ার যত ভালোই থাকুক না কেনো আলো বিহীন কোনো কিছুই দেখা সম্ভব হয় না। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব.) মানবজাতিকে আকল বা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন আল্লাহকে চিনার জন্য, তার বিধানকে বুঝার জন্য। কিন্তু

'নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।' সুরা হিজর, ১৫ঃ৯

এখানেও লক্ষণীয় বিষয় হলো মানুষের জ্ঞান যত বেশিই থাকুক না কেনো যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান চোখের সামনে একটি বিশেষ আলো না জ্বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষের জ্ঞান চোখের জন্য যে আলোর প্রয়োজন। সেটিই হচ্ছে পবিত্র কুরআন মাজীদ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–
-

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের শান্তির পথ দেখান, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তার অনুমতিতে তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।" (সুরা মায়েদাহ, ৫:১৫-১৬)

কুরআন একটি সংবিধান

আল্লাহ (সুব.) মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তা হলো আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

('আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।' সুরা জারিয়াত, ৫১:৫৬)।

ইবাদত বলতে শুধু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজান মাসে সিয়াম পালন করা ও ধনী হলে হজ্জ, যাকাত আদায় করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলাই ইবাদত। এজন্যই আমরা সালাতে দাড়িয়ে প্রতি রাকাআতে বলি–

('আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।' সুরা ফাতিহা, ১:৪)।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেসকল নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয় সেটিই হলো সংবিধান। আর এ সংবিধান দেওয়ার একমাত্র অধিকার তার যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

('সৃষ্টি যার বিধান তার') সুরা আরাফ, ৭:৫৪। কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান থাকা অবস্থায় তা বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করার অধিকার কারো নেই। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

('আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তার হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' সুরা রাদ, ১৩:৪১)। আল্লাহ (সুব.) মানবজাতির জন্য যে বিধান দিয়েছেন সে বিধানটির নামই হলো আল কুরআন। q q q q q
(চলবে) q q q q q

নিয়্যাতের উদ্দেশ্য

মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আমল তিন প্রকার। **১.** (আমালুন মা'আসি বা গুনাহের কাজ), **২.** (আল আমালুন মুবাহা বা সাধারণ বৈধ কাজ) **৩.** (আল আমালুস সালিহা বা নেক কাজ)। প্রথম প্রকার অর্থাৎ, গুনাহের কাজে সওয়াবের নিয়ত করা জায়েয নেই, হারাম। বরং আল্লাহর সাথে উপহাস করার কারণে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। যেমন কেউ একটি পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করল। উদ্দেশ্য তার আয় থেকে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি পরিচালনা করা। অনুরূপভাবে মাজারে দান করা, অথবা মাজার প্রতিষ্ঠা করা এই উদ্দেশ্যে যে তার আয় দিয়ে মাদরাসা, মসজিদ, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি পরিচালিত হবে। এমনিভাবে ঘুষ, সুদ ও অন্যান্য হারাম উপায়ে ভালো কাজ করার জন্য টাকা পয়সা উপার্জন করা এগুলো হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার, মুবাহ কাজে সাওয়াবের নিয়ত করা, ঐ মুবাহ (সাধারণ বৈধ) কাজকে ইবাদতে পরিণত করার জন্য। যেমন ঘরে দরজা-জানালা কাটা। এটি একটি মুবাহ (সাধারণ বৈধ) কাজ। যাতে কোনো সওয়াবও নেই, গুনাহও নেই। তবে যদি উদ্দেশ্য হয় জানালা দিয়ে আলো আসবে আর সে আলোতে কুরআন পাঠ করবে, আজানের ধ্বনি শুনে মসজিদে যাবে তাহলে এটি ইবাদতে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যদি রাস্তার মেয়ে দেখা, গান-বাজনা শোনা, ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে গুনাহের কাজে পরিণত হবে।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, আমলে সালেহ বা নেক আমলের ভেতরে নিয়্যাত করার দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে ১) অভ্যাস থেকে ইবাদতকে পৃথক করা।

যেমন কোনো ব্যক্তি খানা-পিনা করে শুধুমাত্র তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাহলে এটাকে তার অভ্যাস বলা হবে। আর যদি সে এটা করে আল্লাহর নির্দেশ 'তোমরা খাও এবং পান করো' সুরা আরাফ, ৩১ পালন করার জন্য তাহলে এটা হবে ইবাদত। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অসুস্থতাজনিত কারণে দিনের বেলায় পানাহর ও স্ত্রী ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। এটা তার অভ্যাস। এতে কোন সওয়াব নেই। তবে এটি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সিয়ামের নিয়তে করে তাহলে ইবাদতে পরিণত হবে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি সালাতে যেসকল আমল করা হয় তা ব্যায়ামের জন্য করে তাহলে এটা তার অভ্যাস। কিন্তু যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয় তাহলে এটি হবে ইবাদত। একারণেই বিজ্ঞজনেরা বলেন 'অজ্ঞ লোকদের ইবাদতও অভ্যাস আর বিজ্ঞ লোকদের অভ্যাসও ইবাদত'। একজন লোক নতুন কাপড় পরিধান করলো সাজগোজ করার জন্য আরেক জন নতুন কাপড় পরিধান করলো আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করার জন্য। প্রথম ব্যক্তি কোনো সাওয়াব পাবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাওয়াব পাবে। একজন লোক জুমার দিন নতুন কাপড় পরিধান করলো অভ্যাসজনিত কারণে। আরেকজন লোক জুমার দিনে ভালো কাপড় পরিধান করলো রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ-এর অনুসরণ করে। প্রথমটি অভ্যাস, দ্বিতীয়টি ইবাদত।

(২) এক ইবাদত থেকে আরেক ইবাদতকে পৃথক করা।

যেমন একব্যক্তি দুই রাকা'আত সালাত আদায় করছে উদ্দেশ্য নফল ইবাদত, আরেক ব্যক্তি দুই রাকাআত সালাত আদায় করছে উদ্দেশ্য ফরজ সালাত আদায় করা। প্রথমটি নফল, দ্বিতীয়টি ফরজ। এভাবে একজন যোহর-এর ওয়াক্তের ফরজ আদায় করছে অপরজন গতকালের জোহরের কাযা আদায় করছে। দুটোই ইবাদত তবে ভিন্ন ভিন্ন।

যা নিয়্যাতের মাধ্যমে পৃথক করা হয়।

নিয়্যাত কি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী?

না, নিয়্যাত হলো মনের সংকল্প। এটি মনে মনেই থাকবে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং অর্থ না বুঝে তোতা পাখির মতো শিখানো নিয়্যাত পড়া একটি বিদ'আত ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া যার উদ্দেশ্যে নিয়্যাত করা হচ্ছে তিনি তো অন্তরের খবর জানেন। সুতরাং তাকে জানানোর দরকার নেই যে, আমি ফজরের দুই রাকা'আত ফরজ সালাত ক্বিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে আদায় করছি।' কেননা আল্লাহ (সুবঃ) ভাল করেই জানেন আপনি কোন ওয়াক্তের কত রাকা'আত সালাত কার পিছনে কোন দিক ফিরে আদায় করছেন। জনৈক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে নিয়্যাত করতে লাগলো, আমি জোহরের চার রাকা'আত ফরজ সালাত এই ইমামের পিছনে ক্বিবলামুখী হয়ে আদায় করছি। আল্লাহু আকবার। তখন তার পাশে একজন বিজ্ঞ লোক এগুলো শুনতে পেয়ে বললেন, থামুন! আরো কিছু বলতে হবে কোন বৎসরের কত মাসের কত তারিখের সালাত। তাতো বললেন না। আপনি বলুন, আমি দুই হাজার তের সালের পহেলা জানুয়ারি রোজ মঙ্গলবার জোহরের সালাতের চার রাকা'আত ফরজ সালাত এই মারকাজ মসজিদের ইমামের পিছনে ক্বিবলামুখী হয়ে আদায় করছি। একথা শুনে লোকটি তাজ্জব হয়ে গেলো এবং মুখে নিয়্যাত পড়ার পরিবর্তে মনে মনে নিয়্যাত করতে আরম্ভ করলো।

হজ্জ উমরার নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা:

হজ্জের সময় নিয়্যাত পড়া হয়, বলা হয় (লাব্বাইকা বিহাজ্জাতিন) বা (লাব্বাইকা বিউমরতিন)। তাহলে উপরের বক্তব্য কিভাবে সঠিক হতে পারে?

তার উত্তরে আমরা বলবো, না! হজ্জের ইহরামের সময় বা উমরার ইহরামের সময় যেটা মুখে উচ্চারণ করা হয় ওটা নিয়্যাত নয় বরং ওটি একটি সতন্ত্র যিকির এবং শে'আরে ইসলাম। এর মাধ্যমে হজ্জের বিধানকে প্রকাশ করা হয়। একারণেই বিজ্ঞ আলেমগণ বলে থাকেন, হজ্জের তালবিয়া মূলত সালাতের তাকবিরে তাহরিমার মতো। তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত যেরকম সালাত শুরু হয় না তেমন তালবিয়া ব্যতীত হজ্জের ইহরাম পূর্ণ হয় না। এ কারণেই ওখানে বাড়ানো কমানো জায়েয নেই। বরং অন্যান্য দো'আর মতো হাদিসে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে ততটুকুই বলা যাবে।

শিক্ষণীয় বিষয়

অত্র হাদিস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়।

১. হিজরত: এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার বিষয়ের সমাপ্তি ঘটে তবে প্রয়োজন হলে ইসলামের জন্য হিজরত করা সবসময় অব্যাহত থাকবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

-

»

).«

(

'মুআ'বিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি যে, 'হিজরত ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত তওবা বন্ধ না হবে। আর তওবা ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে।'(সুনানে আবু দাউদ হা. নং- ২৪৮১, আহমাদ হা.-১৬৯৫২, ত্ববরানি হা.-৯০৭, বায়হাকি হাঃ-১৭৫৫৬ দারিমি হাঃ-২৫১৩, নাসায়ি হাঃ-৮৭১১, আবু ইয়ালা হাঃ-৭৩৭১।)

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২. ইখলাস এর ব্যপারে উৎসাহিত করা। কেননা এ হাদিসে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) আল্লাহকে সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির আশায় ইবাদতকারী, খ) পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য

যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে তাদের ইবাদত গৃহীত হবে। যারা পার্থিব স্বার্থে ইবাদত করবে তাদের ইবাদত গৃহীত হবে না।

৩. আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি। এ হাদিসের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা:) একটি সুন্দর শিক্ষা দান করেছেন। যদি কোনো বিষয়ের বাস্তব অবস্থা জানা না থাকে তাহলে কোনো একতরফা মন্তব্য করা উচিত নয়।

৪. ছাত্রদেরকে কোনো জিনিস বুঝানোর জন্য বিষয়টিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে বোঝানো। তাহলে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজে বোধগম্য হবে। এ হাদিসে তাই করা হয়েছে।

(চলবে)

'হিজরত ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত তওবা বন্ধ না হবে। আর তওবা ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে।'
(সুনানে আবু দাউদ ২৪৮১, আহমাদ ১৬৯৫২)

রাসুল-অবমাননা : হে মুসলিম! ঈমানী শক্তি অর্জন করো

তরিকুল ইসলাম

আল্লাহর রাসুল (সা.) আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রোজ্বল ব্যক্তিত্ব আঁধারজীবী পশ্চিমকে এমনই বেসামাল করে রেখেছে যে, তারা তাদের ভিতরের কলুষ উন্মোচিত করতেও দ্বিধা করছে না। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত, মার্কিন যুক্তারাষ্ট্রে নির্মিত নোংরা ছবিটা। এটা পশ্চিমের রুচি ও মানসিকতার এক পূতিগন্ধময় উদাহরণ।

এ জাতীয় ঘটনার দ্বারা একদিকে যেমন প্রকাশিত হয় পশ্চিমের দীনতা, অন্যদিকে নতুন করে প্রমাণিত হয় সিরাত ও সুন্নাহর অপরিহার্যতা। একবিংশ শতকের ইউরোপ যান্ত্রিক উন্নয়নে শিখর ছুঁয়ে ফেললেও নৈতিক ও মানবিক ক্ষেত্রে তাদের হাজার বছরের পুরোনা অতীত থেকে বের হতে পারেনি। ঐখানে ওখনো পৌঁছেনি সভ্যতার আলো। এই দীনতা এরা পূরণ করতে চায় মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডার দ্বারা।

বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত জাতি মুসলিম জাতি। তবু তারাই কেন মানবতার শত্রুদের চক্ষুশূল? কেন তাঁদেরকেই আরো বিপর্যস্ত করার এই প্রাণান্তকর প্রয়াস? কারণ, একমাত্র মুসলিম জাতির অধিকারেই আছে ঐ 'অমর-করা' আবে হায়াত কুরআন ও সুন্নাহ, যা মূর্খতা ও বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এক জনপদ থেকে বের করে এনেছিলো এক আলোকিত মানব কাফেলা, যাঁদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের আলো থেকে দিকে দিকে প্রজ্বলিত হয়েছিলো চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য প্রদীপ। শত্রুর এইসব কর্মকাণ্ড এই অমর আলোক থেকে বিচ্ছিন্ন করার ও বিচ্ছিন্ন রাখার কিছু অপপ্রয়াস।

এই সকল ঘটনা প্রমাণ করে আল কোরআনের বিধান ও বিবরণের যথার্থতা। কোরআন তো বারবার বর্ণনা করেছে ইয়াহুদি জাতির দুর্বৃত্তপনা। যারা, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বদা অভ্যস্ত ছিলো আসমানী পয়গামের বিরোধিতায় এবং আল্লাহর নবী-রাসুলগণের অবাধ্যতায়। এমনকি এদের জাতীয় ইতিহাস কালিমালিপ্ত আল্লাহর নবীগণকে হত্যার ঘটনায়। হযরত ঈসা (আ.)কেও এদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে। পরিশেষে আল্লাহ নিজ কুদরতে তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আসমানে। এ শতকের সবচেয়ে বড় পরিহাস এই যে, বর্তমান খ্রিস্টজগৎ তাদের চরম শত্রু ইহুদি জাতির ক্রীড়নক হয়ে আছে। আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে কষ্ট দেওয়ার কোন সুযোগটা এরা হাতছাড়া করেছে? ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল করার কোন চেষ্টাটা ওরা বাদ রেখেছে? কিন্তু এ তো আল্লাহর দ্বীন। আল্লাহই একে রক্ষা করেছেন এবং রক্ষা করবেন। এই সকল দুস্কৃতির ফল ওদের ভুগতে হয়েছে যুগে যুগে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরে ঘুরে আসবে। এটাই ওদের ভাগ্যলিপি।

আল্লাহ তাআলা তো চৌদ্দশ বছর আগেই বিধান দিয়েছেন। 'কাফিররা যেনো মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। কখনো তারা মুমিনদের হীনবল করতে পারবে না।

'আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ তাদের জানেন।' (সুরা আনফাল ৮:৬০)

কে না জানে, বর্তমান সময়টা যতটা না যুক্তির, তার চেয়ে বেশি শক্তির। এখন যুক্তি শোনা হয় শক্তিমানের দূর্বলের নয়। সুতরাং হে মুসলিম! তোমার যুক্তি তখনই ওদের শোনাতে পারবে, যখন তোমার যুক্তির পিছনে থাকবে শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা।

যারা শুধু 'শান্তির কথা' শুনতে ও শোনাতে চান তাদের উপলব্ধি করা উচিত, দুষ্টের দমন ছাড়া সমাজে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় সমাজের ক্ষেত্রেই তা সত্য। এ কারণেই শান্তির ধর্ম ইসলামে আলাদাভাবে আছে জিহাদ ও নাহিআনিল মুনকারের বিধান।

এইসব ঘটনা আরো প্রমাণ করে, 'আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা'- সকল কাফির এক ধর্মের, এক সম্প্রদায়ের। একারণেই দেখি, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় খ্রিস্টসমাজে, ইহুদি সমাজে, নাস্তিক সমাজে এবং পৌত্তলিক সমাজে। ইসলামবিরোধী সাম্প্রদায়িকতায় এরা সব একজোট। সুতরাং এটাই এখন সত্য যে, ভাষা ও ভূখণ্ডের সকল বৈচিত্র্যের মাঝে পৃথিবীতে বাস করে দুটোমাত্র সম্প্রদায় : মুসলিম এবং অমুসলিম। তাই আজ বড় প্রয়োজন, সকল বিভেদ বৈচিত্র্য ভুলে ইসলাম ও ইসলামের নবীর মর্যাদার প্রশ্নে সকল মুসলিমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো এবং সীসাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এসব ঘটনা আরো প্রমাণ করে, বর্তমান যুগের উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মানবাধিকার ও পরমসহিষ্ণুতার মতো শব্দগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এই সকল শব্দ-শর শক্তিমানের স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার। এ কারণেই ব্যাপক মুসলিম-নিধন, মুসলিম জাহানের সম্পদ ও আব্রু লুণ্ঠন এবং ইসলাম ও ইসলামের নবীর অবমাননার পরও ওরা উদার, অসাম্প্রদায়িক, সভ্য ও শান্তি প্রিয়। পক্ষান্তরে প্রাণ ও মাতৃভূমি; সম্পদ ও আব্রু সব হারিয়েও মুসলিম সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক!

সুতরাং হে মুসলিম! তুমি সন্ত্রাসী, তুমি সাম্প্রদায়িক। কারণ তুমি মুসলিম। এখন তোমার ইচ্ছা, এইসব শব্দ-জুজুর ভয়ে নিজ আদর্শ ও অধিকারের দাবি ত্যাগ কর কিংবা এসবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে আদর্শ ও অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হও।

সারা জাহানের রব তো চৌদ্দশ বছর আগেই তার পাক কালাম নাযিল করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি প্রসন্ন হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। বলো, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথ নির্দেশ। (সুরা বাকারা, ২:১২০)

পশ্চিমা মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব

মহিউদ্দিন আকবর

বিশ্বের যেকোনো দেশের যেকোনো সচেতন নাগরিক মাত্রই জানেন, গোটা বিশ্ব আজ চারটি মিডিয়া দানবের আগ্রাসনের শিকার। তারা সম্মিলিতভাবে মিথ্যাচার, বানোয়াট, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ও মানবাধিকার বিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডা নিয়েই সারাক্ষণ মেতে আছে। তারা পরিকল্পিতভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় একটি নীলনকশা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অভিষ্ট লক্ষ্য এক, কৌশলগত অবস্থানও এক। যদিও বাহ্যত তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে। কিন্তু চারটি মিডিয়াই বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, হিংসা, বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়াতে ওস্তাদ। বিশেষত তাদের তাবৎ কার্যক্রমের মূল টার্গেট হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলমান জাতি। যেকোনো মূল্যে দুনিয়া থেকে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে বিশ্বব্যাপী ইয়াহুদি-নাসারা গোষ্ঠীর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপনই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

মিডিয়া চারটির নিয়ন্ত্রণ শক্তিও এক ও অভিন্ন। তাদের অর্থ জোগানদাতা সোর্সগুলোও পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত এবং একটি সমন্বিত গোয়েন্দা সংস্থার নেটওয়ার্কের আওতায় চেইন অব কমান্ড মেনটেইন করে কার্যক্রম চালায়। বিশেষত স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ, ওয়েবসাইট, অনলাইন ও ইন্টারনেট ফ্যাসেলিটির সোর্স এবং রিসোর্সেসও অভিন্ন। তাদের মনিটরিং স্থিতিকে যুগপৎ সাপোর্ট দেবার জন্য তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বিভিন্ন দেশে তাদের লেনদেনের প্রবাহকে ষড়যন্ত্রের সূচনাকাল থেকে জোরদার করে রেখেছে। একই সাথে তারা তাদের আগ্রাসনকে নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী ও উচ্চতর ব্যবসায়ী মহলে শিখণ্ডি সৃষ্টির পাঁয়তারা করেই চলেছে। সেই সুবাদে তারা ক্ষমতার উত্থান-পতনেও সরাসরি নাক গলানোর সুযোগ নিচ্ছে। প্রয়োজনে তাদের নেটওয়ার্কে যুক্ত সাংবাদিক নামধারি এজেন্টদের উচ্চতর গোয়েন্দা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সামরিক প্রতিরক্ষামূলক স্বল্পকালীন কোর্স সম্পাদনের উদ্যোগ নিচ্ছে।

ইতোমধ্যে তাদের অন্যতম দোসর হিসেবে খ্যাত ইংল্যান্ডেরই একটি সংস্থা তাদের এসব জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে। পশ্চিমা আগ্রাসী মিডিয়া চারটি হচ্ছে সিএনএন, ভয়েস অব আমেরিকা, রয়টার্স এবং স্টার টিভি। যদিও প্রথমোক্ত তিনটি মিডিয়া সত্যের অপলাপ ও বিকৃত তথ্যের মাধ্যমে দেশে দেশে পশ্চিমা শক্তির সামরিক কর্তৃত্ব ও শক্তিমত্তাকে তুলে ধরে বরাবরই প্রচ্ছন্নভাবে মুসলিমবিশ্ব এবং পশ্চিমা পরাশক্তিবিরোধী দেশগুলোকে স্নায়ুবিক চাপে ফেলে ভয়-ভীতির মাঝে রাখছে। যুগপৎ বিশ্বের উন্নয়ন প্রয়াসী মুসলিম জাতিকে একটি কল্পিত সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেবার ক্ষেত্রেও গুরুতর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাছাড়া দেশ দেশান্তরে যুদ্ধ বিগ্রহ ছড়িয়ে দেয়া এবং সে সব যুদ্ধে পশ্চিমা পরাশক্তির প্রাধান্য ও বীরত্বকে হাইলাইট করার ক্ষেত্রেও তারা সূক্ষ্ম কৌশল খাটিয়ে চলেছে। অপরদিকে স্টার টিভি অক্টোপাসের মতো ক্রীড়া, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্পকলা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও চলচ্চিত্র জগতে ব্যাপকভাবে পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচার, ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাচারের ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। যা তাদের আগ্রাসী তৎপরতাকে বলতে গেলে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। এক্ষেত্রে স্টার নেটওয়ার্কের স্টারমুভি, স্টার স্পোর্টস, স্টার হিস্টোরিক্যাল চ্যানেল সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে।

পাশাপাশি ডিজনি ওয়ার্ল্ড, এএক্সএন, স্টার ওয়ার্ল্ড, স্টার গোল্ড, ইএসপিএন, স্টার প্লাস, জিটেক্স, স্টার আনন্দ, ডিসকভারি, সনি, টিন স্পোর্টস, এইচবিও, ট্রাভেল এন্ড লিভিং, স্টার ওয়ান, স্টার চায়না, কার্টুন নেটওয়ার্কসহ আরো কয়েকটি পশ্চিমা 'স্যাডো' চ্যানেল প্রকারান্তরে স্টারের নেপথ্য পৃষ্ঠপোষকতায় শিশু-কিশোর ও তরুণদের মাঝে মানসিক বিকৃতি ও নৈতিকতার পতন ঘটিয়ে জড় সভ্যতা, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদি মনোবৃত্তির প্রসার এবং অস্তিত্ববাদি বোধ-বিশ্বাস থেকে তাদের সরিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলার ক্ষেত্রে গুরুতর ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন ভিত্তিক ডেস্ট্রাকটিভ কার্টুন ছবি, বিকৃত ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার সম্বলিত এনিমেশনাল মুভি ও ভিডিও গেম ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দুনিয়ার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার গভীর ষড়যন্ত্রের রোডম্যাপ বাস্ত বায়ন করে যাচ্ছে। ইতিহাসের ক্যানভাসের দিকে গভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণার দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সচেতনভাবে তাকালে এই সকল ভয়াবহ দৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে যায়।

স্মর্তব্য যে, ৭০৮ সালে মুসলিম বীর সিপাহসালার সালাহউদ্দিন আইউবীর হাতে সম্মিলিত ইয়াহুদি-নাসারা গোষ্ঠী চরমভাবে পরাজিত হবার পর, পরাজিত অপশক্তি গোটা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা

করে। যার রেশ চলে টানা দুইশত বছর। নবম শতাব্দীতে এসে জায়েনবাদিরা মুসলিম বিশ্বের কাছে ফের পদানত হয়ে পড়লে তাদের ক্রুসেড থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু ইয়াহুদিরা প্রতিশোধ স্পৃহায় গোপনীয়তার সাথে নিরবে আবর্তিত হতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুইজারল্যান্ডের ব্রাজিল নগরীতে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ইহুদি সাংবাদিক ড. থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে বিশ্ব ইহুদি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তারা গোটা বিশ্বকে কন্ট্রোল করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও সুপরিকল্পিত নীলনকশা প্রণয়ন করে। তারা সকলে একমত হয় যে, বিশ্বকে কন্ট্রোল করতে হলে প্রথমত দুনিয়ার সকল স্বর্ণভাণ্ডার আয়ত্ত করতে হবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থার জাল বিস্তার করে পৃথিবীর সকল পুঁজি কুক্ষিগত করতে হবে। এরপর তারা স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে, আন্তর্জাতিক প্রচার মিডিয়া যেন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে চলে আসে এবং মিডিয়ার সাহায্যে দুনিয়াবাসীর মগজধোলাই প্রক্রিয়া শুরু করে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। সংবাদ তথা সকল প্রচার মাধ্যমের অসাধারণ গুরুত্ব, প্রভাব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, আমরা ইহুদিরা পুরো বিশ্বকে শোষণ করার পূর্বশর্ত হিসেবে পৃথিবীর সকল পুঁজি কুক্ষিগত করাকে প্রধান কর্তব্য মনে করি। তবে প্রচার মিডিয়া আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। আমাদের শত্রুদের পক্ষ হতে এমন কোনো শক্তিশালী সংবাদ প্রচার হতে দেবো না এবং তার মাধ্যমে তাদের মতামত জনগণের কাছে পৌঁছতে দেব না।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রচার মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের ধোয়া তুলে ইসলাম ও ইসলামপন্থী মুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বময় এক ঝড় তোলা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যেই দুনিয়ার মুসলমানদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। একটি মডারেট ইসলামিক গ্রুপ ও অপরটি প্যান ইসলামিক অ্যাক্টিভিটিস গ্রুপ। তারা মুসলিম দেশসমূহের সেক্যুলার ও ইসলামপন্থী সরকার এবং এসব সরকার ও ইসলামী পুনর্জাগরণ পন্থীদের মধ্যকার মতবিরোধের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির তৎপরতা জোরেশোরে চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কোনো মুসলিম সরকার যদি ইসলামী আন্দোলন নস্যাৎ করে দিতে চায় তাহলে তাকে সাহায্য দেবে বলে এগিয়ে আসে। তখন তাদের এই সংবাদ প্রচার করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। পৃথিবীর এমন কোনো সংবাদপত্র, রেডিও সেন্টার, টিভি সেন্টার ও স্যাটেলাইট নেই যারা রয়টার্স থেকে সংবাদ সংগ্রহ না করে। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দুটো প্রচার মাধ্যম বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকাও প্রায় নব্বই ভাগ সংবাদ রয়টার্স থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এ সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার্স ১৮১৬ সালে জার্মানির এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ফলে তার এই রয়টার্স কার্যক্রম অতি সহজেই বিশ্বময় স্থান লাভ করেছিল। রয়টার্স ছাড়া পৃথিবী যেনো চলে না। রয়টার্স হচ্ছে আকাশ সংবাদ সংস্থার রাজাধিরাজ। ইসলামবিদ্বেষী তৎপরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, ভারতও মার্কিন ইহুদি লবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইহুদি প্রচার মাধ্যমগুলো বিশ্বময় ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা আন্তর্জাতিক সূত্রগুলোকে ব্যবহার করছে।

বিশেষ করে মার্কিন ইয়াহুদি প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস ও মৌলবাদিতার' অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে ইসলামী বিশ্বের উন্নয়ন ও জাগরণের নেটওয়ার্ক স্তব্ধ করে দেয়া যায়। ওরা বিশ্বে মিথ্যা সংবাদ প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেছে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ফিলিস্তিনিদের ঘাড়ে চাপিয়ে এ কেন্দ্র মিথ্যা প্রচার চালিয়ে হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালায়। একদিকে এ ঘটনার জন্য হামাসকে অন্যদিকে মিসরের 'আল জামায়াত আল ইসলামিয়া' এর নেতা ড. শেখ ওমর আব্দুল রহমানের অনুসারীদের অভিযুক্ত করা হয়। আফগানিস্তান একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বলেই টার্গেট ছিল তাদের। সে মতে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অন্যদিকে ইসরাইল প্রতিনিয়ত মুসলমানদের বিনা দোষে হত্যা ও আহত করছে এবং ফিলিস্তিন ও লেবাননের লাখ লাখ বসতি ধ্বংস করছে।

কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়াগুলো তাদের সেই অসহায়ত্বের চিত্র একদিনও তুলে ধরেনি, অন্যদিকে পশ্চিমা দেশগুলোতে সামান্য ঝড়, জলোচ্ছ্বাস হলে মিডিয়া তা ফলাও করে প্রচার করে। আগ্রাসী অই পশ্চিমা মিডিয়া জগত বিশ্বে কোথাও যদি মুসলমানদের কোনো অগ্রাধিকার থাকে তা প্রচার না করে তাদের যদি সামান্যতম অন্যায় থাকে তা প্রচার করতে জোর তাগিদ চালায়।

জায়েনিস্টরা পূর্বোক্ত সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুসলমানরা যাতে একটি ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত জাতি হিসেবে আর কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্যে তাদের মাঝে উন্নয়নে নেতৃত্ব দানকারীদের বিরুদ্ধে কল্পিত ও বিভ্রান্তিমূলক ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মুসলিম জনতার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। অপর সিদ্ধান্তে বলা হয়- মুসলমানদের মাঝে ইসলামী চেতনা বিকাশের লোকেরা যাতে, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ নিতে না পারে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন আরব ও মুসলিম দেশ হতে উপসাগরীয় দেশসমূহে মুসলিম জনশক্তির আগমন ঠেকাতে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ব্রিটিশ ও ভারত থেকে অমুসলিম জনশক্তি আনতে হবে। কারণ ওরা কোন না কোনভাবে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতেই পশ্চিমা মিডিয়াগুলো আজ সারা বিশ্বে তৎপর। একদিকে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদি চক্র একের পর এক অস্থির করে তুলছে মুসলিম দেশগুলোকে। অপরদিকে আগ্রাসনের মাধ্যমে আফগানিস্তান ও

ইরাককে দখল করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে শিখণ্ডিদের। আর যারা আজো মাথা নত করেনি, তাদের উপর প্রতিনিয়ত হামলা চালিয়ে সে দেশগুলোকে দখলের পাঁয়তারা চালিয়েই যাচ্ছে। আর তাদের এইসব আগ্রাসনকে ঢাকতে তাদেরই সৃষ্ট এবং তাদেরই অনুগত চারটি মিডিয়া তাদের সাংগঠিত চক্রকে নিয়ে নিষ্ঠারসাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

পশ্চিমা মিডিয়ার এই আগ্রাসন ও তথ্য সন্ত্রাসের মোকাবিলায় আজকে মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে ভাববার এবং ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়াস নিতেই হবে। এ ক্ষেত্রে ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে অক্সফোর্ডের সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের ওপর যে ভাষণ দিয়েছেন তার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে, এমনকি ইতিহাসের পাতাজুড়ে ইসলাম সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে। শুধু অমুসলিমরা নয়, মুসলমান নিজেরাও এই ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ফেরকা ও অসংখ্য মতভেদ। যার ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি। মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যত দূরে সরতে থাকে তাদের পতন তত নিকটবর্তী হতে থাকে।

তিনি আরো বলেন, একজন অমুসলিম যখন কোনো খারাপ কাজ করে তখন তার ধর্মকে দোষারোপ করা হয় না, অথচ যখন একজন মুসলমান এ রকম কাজ করে তখন তাকে সন্ত্রাসী বা মৌলবাদী বা উগ্রবাদী ও জঙ্গি বলে থাকে। ওলকোলার বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে বলা হলো এটা মুসলমানের কাজ অথচ যখন ধরা পড়লো এ কাজ একজন খ্রিস্টান করেছে, তখন তাকে কেউ সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেনি। এই হলো বিশ্ব মিডিয়ার পরিস্থিতি। উত্তর আয়ারল্যান্ডের সহিংসতা ধর্মভিত্তিক ও বসনিয়ার খ্রিস্টান সার্বদের নৃশংসতাকে কোনো দিন খ্রিস্টান সন্ত্রাসবাদ বলছে না। মুসলমানদের সম্পর্কে পশ্চিমাদের বিভ্রান্তি এমন পর্যায়ে যে, তারা ধরে নিয়েছে, সন্ত্রাস ছাড়া মুসলমানদের যেনো আর কোনো কাজ নেই। অথচ পৃথিবীর ইতিহাস এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু খুব কম ইউরোপীয় লেখক মুসলামনদের সম্পর্কে সত্য কথাটি সাহস ও নিরপেক্ষতার সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীতে মুসলমানদের মতো শান্তি খুব কম জাতিরই আছে।

ফিরে আসি আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান মিডিয়া জগতের কাছে। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মিডিয়া ও চলচ্চিত্র হলো অশ্লীলতার একমাত্র হাতিয়ার। আমাদের কিছু পশ্চিমাদের মতো উচ্চ শিক্ষিত লোক আছে যারা ভাইবোন, মাতা-পিতা সহকারে একত্রে স্যাটেলাইট দেখে। একটি দেশে একটি মেয়েকে বস্ত্রহীন করে নাচে, তাকে ধর্ষণ করে এই রকম ছবি দেখাকে তারা ফ্রি মাইন্ড মনে করে। অথচ যে দেশের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রি করে, হালের বলদের অভাবে মানুষ কাঁধে জোয়াল নিয়ে লাঙল টানে সে দেশে চার্লস ডায়নার বিয়ের ছবি এবং সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশের নায়ক-নায়িকার বিয়ের খবর এক সপ্তাহ ধরে প্রচার হলো। আমাদের দেশের আরো এক শ্রেণীর বিলাসপ্রিয় মানুষ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডিসঅ্যান্টিনার সাহায্যে আলোঝলমল পৃথিবীর সভ্যতা দেখে বিবেকহীনভাবে।

এ প্রসঙ্গ অবতাড়নার মূল লক্ষ্য হলো-এই স্যাটেলাইটগুলো আজ কাদের নিয়ন্ত্রণে? এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আওতাধিন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর কথা বাদ দিলে বাকি সবগুলোইতো পশ্চিমাদের মালিকানাধিন। তারা এদেশের বাজার দখল করে নিয়েছে। তারা বাংলাদেশকেও দখলের অথবা এখানে একটি শিখণ্ডি সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছে। সেভাবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মাধ্যমে হলিউড কিংবা তৃতীয় কোনো স্থান থেকে প্রস্তুত করা উদ্দেশ্যমূলক প্রোগ্রাম সম্প্রচার করছে। আবার মাঝে মাঝেই কোনো না কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে তথাকথিত (পশ্চিমা জায়েনিস্টদের আবিস্কৃতি) মৌলবাদি রাষ্ট্র বলেও আখ্যা দেবার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশে কোনো অঘটন ঘটলে তার দায় ভারও বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বিগত বছর কয়েক আগে ভারতের হায়দ্রাবাদের বোমা হামলার সুযোগেও বাংলাদেশকে দায়ী করে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে চাপের মুখে রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদের এই ঘৃণ্য চেষ্টা ধোপে টেকেনি। অথচ আমাদের দেশের চ্যানেলগুলোকে ভারতে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। এই নিষেধাজ্ঞার নেপথ্যে যে পশ্চিমাদের হাত রয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি? পর্যবেক্ষক মহল বলছেন, এরও মুখ্য কারণ হলো যে, বাংলাদেশ একটি শান্তিকামী মুসলিম রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

সঙ্গত কারণেই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমা মিডিয়া মূলত: সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে মিডিয়া আগ্রাসন চালাচ্ছে তার একমাত্র টার্গেট মুসলিম জাতি ও সম্পদ সমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহ। এই আগ্রাসন প্রতিরোধ করে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে সম্মিলিত মুসলিম বিশ্বকে একটি শক্তিশালী মহাকাশ স্যাটেলাইট স্থাপন এবং তাকে কেন্দ্র করে একাধিক মিডিয়া সেন্টার গড়ে তোলার কোনোই বিকল্প নেই। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যত তাড়াতাড়ি এই বাস্তবতাকে অনুভব করবেন, মুসলিম বিশ্ব ততই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

লেখক: সাহিত্যিক-সাংবাদিক;
আন্তর্জাতিক ভাষ্যকার ও রাজনৈতিক
বিশ্লেষক

মিডিয়া চারটির নিয়ন্ত্রণ শক্তিও এক ও অভিন্ন। তাদের অর্থ যোগানদাতা সোর্সগুলোও পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত এবং একটি সমন্বিত গোয়েন্দা সংস্থার নেটওয়ার্কের আওতায় চেইন অব কমান্ড মেনটেইন করে কার্যক্রম চালায়। বিশেষত স্যাটেলাইট, মাইক্রওয়েভ, ওয়েব সাইট, অন লাইন ও ইন্টারনেট ফ্যাসেলিটির সোর্স এবং রিসোর্সেসও অভিন্ন।

মালালা নাটকের মঞ্চায়ন ও গণতন্ত্রের চটপটি

রিপোর্ট এক্সরে : রবি আচার্য

বিবিসির তৈরি গল্প যে মালালা হচ্ছে এমন একটা মেয়ে যাকে শুধু স্কুল যাওয়ার প্রেরণা জোগানোর জন্য গুলি খেতে হলো। মালালাও স্কুলে যেতে চায় অন্যসব মেয়েদের মতো। তার চারপাশে অন্যান্য মেয়ে বান্ধবীরাও যেনো স্কুলে যেতে পারে সে শুধু এটুক স্বপ্ন দেখে। সে কলম নামের একটি ব্লগ লিখে। বিবিসির ব্লগে কতোটা আবেদনময় তার ভাষা। সে ব্লগের শুরুটাই করে এভাবে। 'আমার মা আমার কলমের নামটা খুব পছন্দ করতো। বাবাকে বলতো ওর নামটা ওর কলমের নামে গুল মুকাই কেনো রাখা হলো না। আমিও এই নামটা পছন্দ করি। কেননা আমার আসল নামও দুঃখ কষ্ট দূরকারী।' ভাবুন। পাঠক আবার একটু ভাবুন। একটা এগার বছরের মেয়ে কি করে এতো আবেদনময় ভূমিকা তৈরি করতে পারে। আর পাকিস্তানের অনেক শিশু কিশোরই তালেবান-এর আক্রমনের শিকার তারাই বা কজন এ সুযোগ পায় বিবিসির ব্লগে লিখার।

মালালা। এ তিনটি অক্ষরের কি ক্ষমতা। যা সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়। সারা বিশ্বে মালালা পরিচিতি নারীশিক্ষায় আন্দোলনকারী এক প্রতিবাদী তরুণী। যে তার শিক্ষার অধিকার আদায়ের জন্য মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। যার ব্যাপারে কথা বলে বান কি মুন, গর্ডেন ব্রাউন, হিলারি ক্লিন্টন এমনকি বারাক ওবামা এ থেকে বাদ থাকে কিভাবে? গর্ডেন ব্রাউন জাতিসংঘে স্লোগান দিলেন– 'আমিই মালালা। নিউইর্য়ক টাইমস ওবামার চেয়ে মালালাকে বেশি জনপ্রিয় করে ছাড়লো।' মেডোনা, যার বিরুদ্ধে তার দেহরক্ষী জোরপূর্বক বিছানার সঙ্গী হওয়ার অভিযোগ করলো' তিনি তার পিঠে মালালা নাম লেখলো। একটি নাটকের কী চমৎকার মঞ্চায়ন! শেক্সপিয়র ঠিকই বলেছিলেন– 'এ পৃথিবীটা আসলে মঞ্চ আর আমরা সবাই অভিনেতা।' তবে অভিনেতা হচ্ছে তারা যাদের আছে পেশিশক্তি। আর দর্শক হচ্ছে তারা যারা আমাদের মতো ৩য় বিশ্বের অধিবাসী। আসলে শেক্সপিয়র তো ব্রিটেনের মতো পরাশক্তির দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন তাই তিনি দর্শক কে হবে তা ভাবতে পারেননি। কিন্তু আমাদের মতো দেশে বসবাস করলে ঠিকই তিনি বুঝতে পারতেন দর্শক কাকে বলে?

মালালাকে আসলে গুলি করা হলো। আর গুলি করা হলো তখন যখন পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি অংশ সরাসরি ড্রোন হামলার বিরোধিতা করে। সৈন্যদের প্রকাশ্য বিরোধিতার ২য় দিনই মালালাকে আক্রমণ করা হয়।

আরও অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, আক্রমনকারীর বোনের ও খোঁজ পাওয়া গেলো। সে দুঃখ প্রকাশ করেছে তার ভাইয়ের এই অনৈতিক কর্মকান্ডে। শুধু তাই নয় বরং শেষ দৃশ্যপট তৈরি করা হলো তাকে পাকিস্তান সামরিক হাসপাতাল থেকে ব্রিটেনে স্থানান্তর করে। এখানে সারা পৃথিবীকে দেখানো হলো মেয়েটির কি মারাত্মক মৃত্যুমুখী অবস্থা। যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। কিন্তু আদৌ কি মালালার গায়ে গুলি লেগেছিলো? আদৌ কি সে মৃত্যুশয্যায়?

পাকিস্তানের মিঙ্গোরা প্রদেশের প্রধান হসপিটালের কর্তব্যরত ডাক্তার বলেন– মালালা আহত। তবে তা মারাত্মক নয়। একটি গুলি তার মাথায় অন্যটি তার কাঁধে লেগেছে। কিন্তু সিএনএন প্রচার করলো– যে বুলেট তার মাথা বেধ করে মেরুদন্ডে পর্যন্ত আঘাত হেনেছে। একটা গুলি তার কপালে লাগলো তারপর তার স্কাল ভেদ করলে এরপর যে কোনোভাবে তার গলার কাছাকাছি কাঁধে গিয়ে পৌছল। প্রকৃত অর্থেই সত্যটা কি? আসলে তাকে দুটো গুলি করা হয়েছিলো মাথায়। যা কখোনো গলা কাঁধের কাছাকাছি পৌছায়নি। আর এ সত্যটা ওরা চেপে যায়। কেউ একজন এই সত্যটা দেখেছিলো আর একটি ছবি পোস্ট করে দিয়েছে "এনএবরি মেন" নামের আমেরিকান ব্লগে।

অফিস কর্মচারীদের ভাষ্য আমরা শুনি। যারা বলেছে সে খুবই মারাত্মক

অবস্থায় আছে। 'একটা বুলেট তার কপাল ভেদ করে তার গলার কাছাকাছি কাঁধে আঘাত হানে। সংবাদ সংস্থা এএফপি এজেন্সির কাছে একজন ডাক্তার বলেন।
কিন্তু নিরপেক্ষ সংবাদ সংস্থা এনবিসি নিউজ এর প্রশ্নে একজন কর্মচারী বলে তাদের কোনো সংবাদ সংস্থার সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়নি। কোন ধরনের ডাক্তার এ কথা বলতে পারে যে তাকে গলায় গুলি করা হয়েছে। তবে এ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের অর্থ কি? আসলে যুদ্ধ পূর্ববর্তী প্রপাগান্ডা চালিয়ে মানুষের মাঝে যুদ্ধের এক ধরনের সমর্থন তৈরি করা। আর প্রত্যেক দেশই যে কোনো দেশে আক্রমণ এর পূর্বে প্রপাগান্ডা অপপ্রচার, উসকানি, প্রচার করে জনসমর্থন তৈরী করে নেয়ার জন্য। আর তাই রাজা আশফাক কায়ানি বলে– সে আমাদের মেয়ে।' জেনারেল আশফাক পারভেজ কায়ানি বলেন 'মালালাকে আক্রমন করে সন্ত্রাসীরা তাকে একজন মানুষ হিসেবে ভেবে ভুল করেছে। সে শুধু একটা কিশোরী নয় সে হচ্ছে সাহসীকতার আইকন। যে শুধু দেখিয়েছে সোয়াতের মানুষ এবং এ জাতি কি পরিমাণ ত্যাগ সয়েছে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।' এভাবেই প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তানি মিলিটারিরা এ নাটকের নাট্যকারের ভূমিকা পালন করে।
পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপ লাইনটাই মূলত এ দ্বন্দ্বের কারণ। রাশিয়াও এখন এর মাঝে জড়িয়ে । কেননা রাশিয়া এখন পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ইরানি তেল ভারত ও পাকিস্তানে আনার জন্য পাইপলাইন তৈরির অর্থয়ান করছে। এটা হচ্ছে তেলের লোভনীয় বাজার যা ইউনিকল দখল করতে চাইছে তাদের ট্রান্স আফগান পাইপলাইন এর মাধ্যমে। যদিও তারা গত তালেবান সরকার এর সাথে ১৯৯৯–২০০০ একটি চুক্তি থেকে ফিরে আসে। আর এ তেলের বাজারের প্রতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হতাশ হয়।
আইপিআই বা পিস পাইপলাইন নির্মানের প্রাথমিক পরিসংখ্যান চালানো শেষ। ডিসেম্বর এর মধ্যে কাজ শুরু হওয়ার কথা। এরই মধ্যে ইরান তাদের অংশের পাইপলাইন তৈরি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু পাকিস্তান আদৌ তার অংশের পাইপলাইন তৈরি শুরু করবে কিনা সন্দেহ। কেননা এখনই তো কতো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। মালালা নামের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। বৈধতা পেয়েছে যুদ্ধ। আগ্রাসন। মুক্তবাজারের পণ্যের মতো যুদ্ধবাজ আমেরিকাও পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পেলো।
আর একের পর এক প্রচার করা হলো নিষ্পাপ মালালার মুখরোচক খবর। যা সহজে হযম করা শুরু হয়ে গেছে। গল্পটা আসলে কি? বিবিসির তৈরি গল্প যে মালালা হচ্ছে এমন একটা মেয়ে যাকে শুধু স্কুল যাওয়ার প্রেরণা জোগানোর জন্য গুলি খেতে হলো। মালালাও স্কুলে যেতে চায় অন্যসব মেয়েদের মতো। তার চারপাশে অন্যান্য মেয়ে বান্ধবীরাও যেনো স্কুলে যেতে পারে সে শুধু এটুক স্বপ্ন দেখে। সে কলম নামের একটি ব্লগ লিখে। বিবিসির ব্লগে কতোটা আবেদনময় তার ভাষা। সে ব্লগের শুরুটাই করে এভাবে। 'আমার মা আমার কলমের নামটা খুব পছন্দ করতো। বাবাকে বলতো ওর নামটা ওর কলমের নামে গুল মুকাই কেনো রাখা হলো না। আমিও এই নামটা পছন্দ করি। কেননা আমার আসল নামও দুঃখ কষ্ট দূরকারী।' ভাবুন। পাঠক আবার একটু ভাবুন। একটা এগার বছরের মেয়ে কি করে এতো আবেদনময় ভূমিকা তৈরি করতে পারে। আর পাকিস্তানের অনেক কিশোরই তালেবান এর আক্রমনের শিকার তারাই বা কজন এ সুযোগ পায় বিবিসির ব্লগে লিখার। আর সে কিভাবেই এতো পরিচিত পেলো। কে বা তাকে সারা বিশ্বে এতো পরিচিত করে তুললো। মালালাকে সারা পৃথিবীর দৃশ্যপটে তুলে আনেন এডাম এলিক। কে এই এডাম এলিক তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই।
এডাম এলিক একজন নিউইর্য়ক টাইমসের বিদেশি সংবাদ রিপোর্টার। পাশাপাশি সে সিআইএ এর একজন এজেন্ট। সেই মালালার গল্প বা নাটকটি সারা বিশ্বে মঞ্চস্থ করতে বড় ভূমিকা পালন করে। যখন তালেবানদের বিরোধিতার মুখে সোয়াতে মেয়েদের সরকারি স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তার বাবা একটি বেসরকারি লাভজনক স্কুলের মালিক ছিলো। স্কুলটি ছিলো মেয়েদের। ঠিক এ সময় এডাম এলিক পাকিস্তানে আসে। তার প্রয়োজন স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে একটি ইন্টারভিউ। যাতে প্রমাণ করা যায় তালবানদের অসভ্যতা। হালাল করা যায় ড্রোন আক্রমণ। পাওয়া যায় কিছুটা সমর্থন নিজেদের ড্রোন নামের বর্বরতার পক্ষে। এই এডাম এলিক কিভাবে তাকে একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে রিপোর্টি তৈরি করে।
সে জার্নালিজমে পড়াশুনা করেছে–কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন এবং ওবারসিস প্রেসক্লাব থেকে। যা সিএনএন ও নিউইর্য়ক টাইমসের সাংবাদিকরা পরিচালনা করে থাকে। থাকে অনেক সিআইএর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষক। এই এডাম ইলিক রাশিয়ায় আমেরিকান সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ এর একটি কোর্স পরিচালনা করে। ঘটানাটা ছিল ২০০৪ এ। সে প্রশিক্ষণে একটি বেফাঁস বক্তব্য দিয়ে বসে। যা তার ভাষায় উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছিনা। "I collect quotations, globes, and foreign propaganda posters." Adam
মালালাকে প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরলো সেই এডাম এলিক। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। উদ্দেশ্যটা বেশি কিছু নয়। খুব সহজে বুঝা যায় কেনো তারা তাকে এতোটা পরিচিতি দিল সারা বিশ্বে? শুধু আক্রমণের বৈধতা পাওয়া আর সোয়াত ও ওয়াজিরিস্তানে খনিজ সম্পদ দখলের বৈধতার জন্যই এতো নাটকের মঞ্চায়ন। আর আফগানিস্তান থেকে একটি পাইপলাইন তৈরি করে নিজেদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রান্স আফগান পাইপলাইনের প্রজেক্ট চালু করা। আর ইরানের সাথে পিস পাইপ লাইন প্রজেক্ট বন্ধ করতে বেলুচিস্তানে অস্থিতিশীল করে তোলা ।
এ নাটকের প্রাথমিক মঞ্চায়নে হলব্রুকও আছেন। যিনি পাকিস্তানে আমেরিকান অ্যাম্বেসীর একজন সিআইএ গুপ্তচর। আর হলব্রুককে অনেকে স্বত্বপ্রণোদিত বাবা বলেন। মালালার পিতা যখন তার স্কুল বন্ধ

হয়ে যায় প্রথম আমেরিকান অ্যাম্বেসীর সহায়তা চান। অ্যাম্বেসীর নিরাপত্তা বিশ্লেষক রিচার্ড এগিয়ে আসে। তার প্রথম এগিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিলো লাভজনক স্কুলগুলোকে সচল করার সহায়তা প্রদান। কিন্তু তিনি যখন তার উচ্চপদস্থ সিআইএ এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন তার এ ঘটনাকে আস্তে আস্তে সোয়াত উপত্যকার খনিজ সম্পদ, পাইপলাইন নির্মাণ এর সাথে যুক্ত ও পরে এডাম এলিকের মাধ্যমে মালালাকে নিয়ে নিউইর্য়ক টাইমসে প্রতিবেদন প্রচার করে তাকে পাকিস্তানি তথাকথিত সাংবাদিকদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় করে তুলে। পাকিস্তানি সাংবাদিকরা সত্যিকারার্থে আমেরিকানদের সংস্রব পেতে কতোটা কাঙাল তা উইকিলিকস তাদের আমেরিকান অ্যাম্বেসির ফাঁস হওয়া খবরে বলে– 'পাকিস্তানি সাংবাদিকদের খুব সহজে কেনা যায়।' সেই পাকিস্তানিরা তাকে নিজের দেশে তুমুল জনপ্রিয় করে তুলে। আর মালালার সাক্ষাৎকার পাকিস্তানি মিলিটারির কিছু স্বার্থানেষী মহল এর সমর্থনে, সিআইএ এর মন মতো ও ন্যাটো এর মন মতো প্রচার হতে শুরু করে। শুধু পাকিস্তানি সাংবাদিকদের এটুকুই আশা যদি কোনোভাবে আমেরিকান সুদৃষ্টি পাওয়া যায়। পিস পাইপ লাইন ও ট্রান্স আফগান পাইপ লাইন এতে কিভাবে জড়িত তাই উল্লেখ করার মতো। কেননা দ্যা নেশন পত্রিকায় মে ২০১২ তে প্রকাশ পায় যে 'আমেরিকানদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ট্রান্সআফগান ইন্ডিয়া পাইপলাইন নিশ্চিত করা। আর ইরানের সাথে তৈরি পাইপলাইন প্রজেক্টকে বন্ধ করা। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমেরিকা অনেকসময় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর প্রজেক্ট উন্নয়নে অর্থায়ন করে আর এটাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকবারই দেখা গেছে।' `However, the overriding American objective to promote TAPI is to ensure that the IPI project is effectively killed. America has a history of bulldozing economically unpopular projects in exchange for politico-strategic gains." The Nation May 2012

রাশিয়ান ও ব্রিটেন কে আশির দশকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ দখলের জন্য অনেকট সময় কোল্ড ওয়ারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এটাও ঠিক এমন একটা শীতল যুদ্ধের শুরু। ইরানি পাইপ লাইন বা আইপিআই ও ট্রান্স আফগান ইন্ডিয়ান পাইপলাইন বা টিএপিআই হচ্ছে আধুনিক যুগের নতুন গ্রেট গেম। মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ অঞ্চলের তেল ও গ্যাসের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা। আমেরিকা ও তার সহযোগিরা চায় পাকিস্তান যেনো আইপিআই প্রজেক্ট ত্যাগ করে। যেমনটা ইন্ডিয়া ইরানিদের সাথে তাদের তৈরি পাইপলাইন বন্ধ করে দিয়েছে। আর চায়না ও রাশিয়া পাকিস্তানকে সমর্থন দিচ্ছে যাতে করে তারা আই পি আই চালু রাখে। The Nation May 2012

কিন্তু ট্রান্স আফগান ইন্ডিয়া পাইপলাইন অনেক জাতীয়তাবাদী শক্তির বাধার সম্মুখীন। কেননা এ অঞ্চলের অনেক জাতিয়তাবাদী মনে করে আসলে এতে করে তাদের খনিজ সম্পদের ওপর বিদেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে। আর দেশের খনিজ দখল চলে যাবে বিদেশিদের হাতে। কিন্তু ইরান পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া পিস পাইপলাইন এখন বেলুচিস্তানের মাঝ দিয়ে তৈরি হচ্ছে। অনেকেই ভাবে হয়তো এটা তৈরি সম্পূর্ণ হলে ইন্ডিয়া তার মত পরিবর্তন করতেও পারে। মালালার কাহিনীর সত্যতা বোঝার জন্য অবশ্যই আমাদের পাইপলাইন নিয়ে রাজনীতি বুঝতে হবে। যদি টিআইপি আই প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে আমেরিকার দরকার সোয়াতের নিয়ন্ত্রন। ঠিক তেমনি আইপিআই বা পিস পাইপলাইন বন্ধ করতে হলে দরকার বেলুচিস্তানকে অশান্ত করা। আর এ লক্ষেই তারা মালালার নাটকের মঞ্চায়ন করে। যাতে করে সহজে দুটো অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আক্রমণের বৈধতা পাওয়া যায়। নিচে পাইপলাইন দুটোর একটি ম্যাপ দেয়া হলো।

GET THE PICTURE?
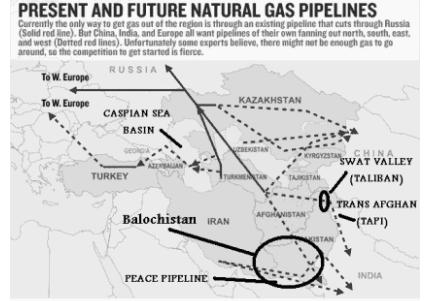
আর আমেরিকা তাই করে যাচ্ছে। বেলুচিস্তানের জনগণ তাদের সায়ত্বশাসন চায়। একটি স্বাধীন ও সায়ত্বশাসিত বেলুচিস্তান অধিকাংশ বেলুচদের কাম্য। বেলুচরা মনে করে আইপিআই বা পিস পাইপ লাইন তাদের অর্থনীতিতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারবে। তবু যেহুতু এই পাইপলাইন তাদের প্রাথমি গ্যাস সংকট মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে তাই তারা এ নিয়ে খুবই আগ্রহী। তারা অধিকাংশ মূলত সেকুলার বা আধুনিক মতবাদে বিশ্বাসী। গত দু'দশক আগেও তাদের মাঝে তালেবান মতবাদ ততটা সর্মথতিত বিষয় ছিল না। (উইকিলিকস)

ঠিক এসময় যদি আইপিআই বা পিস পাইপলাইন যদি বন্ধ করতে হয় তবে প্রথমত দরকার বেলুচকে অশান্ত করা। তারপর প্রয়োজন সায়ত্ব শাসনের দাবি তোলা দলগুলোকে দমন পীড়নের মাধ্যমে নিজেদের নিয়ত্রণ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা। আর বাঘা বাঘা কয়েকজন নেতাকে রাজপথ থেকে সরিয়ে দেয় যাতে নির্বিঘ্নে এই পাইপলাইন প্রজেক্ট সহজে বন্ধ করার যৌক্তিক কারণ তৈরি করা যায়। তারপর সুযোগমতো নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করা। গত পাঁচ বছর যাবত পাকিস্তানি বিশ্বাসঘাতক শাসকরা বেলুচিস্তানে ঠিক তাই করে যাচ্ছে। বেলুচরা ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। বিপ্লবের মাধ্যমেই নিজেদের মুক্তি খুঁজে পাওয়া চেষ্টা করছে। আর যে কোনো বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন কোনো একটা আর্দশের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা। বেলুচরাও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। আর তারা তালেবান মতদার্শ আঁকড়ে ধরেছে।

তাই বেলুচদের যদি তালেবান বলা হয় তবে তার উসকানি দাতা আমেরিকান সিআইএ বা পাকিস্তানে আইএসআই যারা নিজেদের জনগণের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। আর ঐতিহাসিক ভাবেই পাকিস্তানের আর্মিরা বিশ্বাসঘাতক ও মহাপ্রতারক। তাই জিয়াউল হকের ফাঁসি গলায় পড়ে ভুট্টো বলেছিলো 'যে সেনাবাহিনী আমাকে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দিলো, যাদের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আমি শান্তিমূলক সমাধান পৌঁছাতে পারিনি তারাই আমাকে...'। এখানে উইকিলিকসের হুবাহুব তথ্য উদৃত হলো। 'Although Baloch people are mostly secular in nature, the invasive influence of Pakistani intelligence agencies in Balochistan and extremist religious parties in the region are propagating extremism in Baloch societies. The spread of Talibanism is also a constant threat to Baloch and its cultural values. In the past sixty years, Balochis have persistently rejected extremism and Talibanism in the region.' Wiki

২০১১ মে মাসে হিউম্যান রাইট ওয়াচ প্রকাশিত বেলুচদের অপহরণ ও গুম নিয়ে প্রকাশিত একটি রির্পোটের শিরোনাম ছিল "We Can Torture, Kill, or Keep You for Years" এখানে বিস্তারিত বলা হয় বেলুচদের কিভাবে আইএসআই তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিআই এর মাধ্যমে বা সহায়তায় কতো সহজে অপহরণ করে, গুম করে হত্যা করে। অনেক সময় স্থানীয় পুলিশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহজে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেয়। আর বেলুচ জাতীয়বাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তরাই এর প্রথম শিকার। কারণ এ জাতীয়তাবাদী শক্তি দমন করলেই তো সহজে এ অঞ্চলের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বন্ধ করা যাবে পিস পাইপ লাইন। ইরানের কাছে তুলে ধরা যাবে যে অঞ্চল অস্থিতিশীল। এখানে পাইপলাইন তৈরী বিলিয়ন ডলারের ঝুঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই যদিও পাকিস্তান ইরান ও ভারতের সাথে চুক্তি করেছে তারা এখন এ পরিস্থিতে এ প্রজেক্ট চালু রাখতে পারছে না। আর অসংখ্য যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য তো মহাপ্রতারক গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ তো আছেই। কিন্ত নিজেদের দেশ অস্থিতিশীল করে যে নিজেদের মানুষকে নিজেদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করার জন্য যথেষ্ট তা পাকিস্তানি আর্মির প্রতারক অফিসাররা এখনো বুঝেনি। কিন্তু তারা বুঝবে যখন আমেরিকা পাকিস্তানি পারমাণবিক বোমা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেবে। আমেরিকান ইহুদি ও ব্রিটিশদের বড় ধরণের চক্রান্ত এখানে কাজ করছে। পাকিস্তানকে নিজের জনগনের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করে তুলাই এসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাদের উদ্দেশ্য। আর তাই তাদের অসংখ্য গোয়েন্দা ঘোরে ফিরে এখন পাকিস্তানের রাজপথে। আর পাকিস্তানি তথাকথিত সুশীল সমাজ তো আছেই। যাদের খুব সহজে টাকায় কেনা যায়। যে আর্মি অবসর প্রাপ্ত অফিসাররা, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা শুধু আমেরিকান এম্বেসীর দাওয়াত পেতে যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। তারা সবাই প্রস্তুত তাদের দেশের পরমাণু শক্তি অন্যদের হাতে হস্তান্তর করতে। আর সে মহাবিশ্বাস ঘাতক মিডিয়া তো বাংলাদেশের মতোই। যারা ড. আব্দুল কাদির যেনো কখনো নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য তাকে তালেবানের সহায়তাকারী করে ছাড়লো। পাকিস্তানের পরমাণু শক্তির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই জয়নাবাদ ও আগ্রাসীদের মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর কিছু নয়। এ প্রমাণের জন্য বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। গার্ডিয়ান অক্টোবর একুশ তারিখের সিআইএ এর এনালিষ্ট ব্রুস রিডলের কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট। তিনি ওবামা ও রমনির তৃতীয় নির্বাচন প্রতিযোগিতার বির্তকের প্রাক্কালে বলেন– 'ওবামা ও রমনির পাকিস্তানের পরমাণূ শক্তি নিয়ে ভাবা উচিত। এই পরমাণু অস্ত্র আমেরিকার জন্য বড় ধরনের হুমকি।'

এন এবরিমেন ব্লগে সেহজাদ খান নামের একজন পাকিস্তানি লেখেন 'মালালার উপর আক্রমণের নাটক আসলে শুধমাত্র সেনাবাহিনী ও আমেরিকান ড্রোন আক্রমণের বৈধতা অর্জন করা। এর আগেও সোয়াত উপত্যকায় আক্রমনের প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্য এ ধরনের একটি ভিডিও নাটক 'জিএইচকিউ' এর উপর প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে জনগন তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে। সরকার যখন সেই সি আই এজেন্টকে দুই পাকিস্তানি খুন করার পরও চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি দিলো তখন জনগণের আর বোঝার বাকি থাকলো না। একারণে মেহরান বিমানবন্দরে ও কামরা বিমানবন্দরেও আক্রমণের নাটক সাজিয়ে তার যুদ্ধের তালেবানের বিপক্ষে জনসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ। জনগণ বুঝতে পারে এরা হচ্ছে সেই বিশ্বাসঘাতক যারা রেইমন্ড ডেভিসের মতো সিআইএ এজেন্ট ও ব্ল্যাক ওয়াটার নামের ইহুদি যুদ্ধবাজ সংস্থাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ করে দেয়।'

আর এধরনের নাটকগুলো সাজানো মানুষের ওপর মনোগত অপারেশন চালানোর জন্য। যাতে করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের কাছ থেকে সর্মথন আদায় করে তালেবানের নামে সাধারণ মানুষের জীবন অস্থিতিশীল করে বেলুচে পাইপলাইন নির্মান বন্ধ করা ও সোয়াতে নিরাপদ পাইপলাইন নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো। আর এতেও যদি নিরাপদে পাইপলাইন প্রতিষ্ঠা করা না যায় সোয়াতে তবে কি করে অন্য পাইপলইন নির্মাণ করা হবে তারও পরিকল্পনা শেষ। ব্রিটিশ কোম্পানি পেনশন এ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। যার ব্যয় ২.৫০ বিলিয়ন ডলার। প্রস্তাবিত পাইপলাইনের উপরের অংশের স্থান অর্থাৎ সোয়াত উপত্যকায় ড্রোন হামলা তুলনামূলক বেশি। আর এতেও যদি নিরাপদভাবে পাইপলাইন প্রতিষ্ঠা করা না যায় সোয়াতে তবে কি করে অন্য পাইপলইন নির্মাণ করা হবে তারও পরিকল্পনা শেষ। যা নিচের প্ল্যানের মানচিত্রে স্পষ্ট বুঝানো হয়েছে। আর এনার্জি বাংলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এ চিত্রটি।

ব্রিটিশ কোম্পানি পেনসন এ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। যার ব্যয় ২.৫০ বিলিয়ন ডলার। প্রস্তাবিত পাইপলাইনের উপরের অংশের স্থান অর্থাৎ সোয়াত উপত্যকায় ড্রোন হামলা তুলনামূলক বেশি। তাই ড্রোন হামলার জন্য সোয়াতকে তালেবানের আস্তানা বলে প্রচার করতে হবে আর বেলুচকে অশান্ত করতে হবে আইপিআই বন্ধ করতে হবে। আর সর্বশেষে পাকিস্ত-ানকে অস্থিতিশীল করে পারমাণবিক অস্ত্র নিজেদের হাতে নিতে হবে। এই তো রাজনীতি। এই তো গণতন্ত্রের চটপটি খাইয়ে সারাটা বিশ্বকে অচল করে তোলা।

Department of Development studies
University of Dhaka

ভয় পেওনা ফুলকলিরা

সৈয়দা তাসমিয়া তারাননুম
বিনতে ইসহাক

ভয় পেওনা ফুলকলিরা,
সত্য কথা বলতে,
ভয় পেওনা একটুখানি,
দ্বীনের পথে চলতে।
ভয় পেওনা থাকতে একা
মোটেই একা নও,
তোমার সাথে আল্লাহ আছেন
তারই সাথী হও।

জেগে উঠো

নকীব মাহমুদ

আল জিহাদের ডাক এসেছে
চলরে ছুটে চল
রণাঙ্গনের নীল আকাশে
তারা হয়ে জ্বল।
আজ মুছেছে মজলুমানের
করুণ চোখের জল
তোর আঘাতে কাফির দলে
নামুক লাশের ঢল।
তোর ডাকে আজ উঠুক জেগে
বিশ্ব মুসলমান
ঐ জালিমের প্রাসাদখানা
হোক ভেঙে খান খান।
তুই যদি আজ ঐ জালিমের
পারিস নিতে প্রাণ
চারদিকেতেই ছড়াবে আজ
সত্য জয়ের ঘ্রাণ।

কোথায় হে সিংহ শার্দুল

সুলতান মাহমুদ

জিহাদের ময়দানে যখন শতভাই শহীদ
তৃষ্ণা মিটে গেল পুত আত্মার, অনবদ্য কাল, ইতিহাসের
তবু দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায় বিঁধল বিষকাটা
আবেগে ফিনকি দিয়ে উঠল নীরবতা
মানব নামক হিংস্র হায়েনার কাছে
আর কত অসহায় হবে মুসলিম
আর কত দিগ্বিদিক শূন্য উৎকণ্ঠা, বর্বর নির্মমতা
আর কত হৃদয় কাঁদানো আহাজারি, আর কত বিভীষিকা
জুলুম-নির্যাতনের আকাশ-বাতাস কম্পিত আর কত কান্না
আর কত নিষ্পাপ শিশুর করুণ মৃত্যু যন্ত্রণা
আর কত সন্তানহারা বাকরুদ্ধ মায়ের নীরব চিৎকার বেদনা
আর কত মা-বোনের সম্ভ্রম হারানো অশ্রুত আর্তনাদ
আর কত দুর্বল-অক্ষম বৃদ্ধের নিস্তেজ ফরিয়াদ
আর কত কারারুদ্ধ ভাইয়ের অবুঝ শিশুরা চেয়ে থাকবে দিগন্ত
আর কত কুরআনের অবমাননা, নবীর ব্যাঙ্গ চিত্র
আর কত আরাকান-কাশ্মীর-আফগান হবে রক্তাক্ত
আর কত আলস্য-ভয়-হতাশায় থাকবে তুমি ঘুমন্ত
হে মুসলিম আজ তুমি কোথায়?
ময়দান আজ আত্মত্যাগ চাই, মুর্ছিয়া মায়াকান্না নয়
হে খালিদ-উসামার উত্তরসূরীরা তোমরা কোথায়?
আজ বুকের তপ্ত রাঙা খুন চাই, সমবেদনা জানানো অশ্রু নয়
কোথায় সে বাতিল হৃৎপিন্ড কাঁপানো সিংহ শার্দুল?
কোথায় তুমি হে গোরাবা!
তোমার প্রতিক্ষায় আজও শত-হাজার-লক্ষ মা-বোন-শিশু-বৃদ্ধ।
মিটিয়ে দিতে জাহিলিয়াতের আস্ফালন
তুমি জেগে ওঠো, জেগে ওঠো বিদগ্ধ রক্তিম আভায়
প্রতিশোধের অদম্য স্পৃহায়
জেগে ওঠো, ত্বা-গুতের কবর রচনায়
কাপুরুষতা ঝেড়ে অপেক্ষা-প্রতিজ্ঞার শৃঙ্খল ভেঙে
প্রস্তুত হও, শপথ নাও, শোন ঐ আজান
হও দুঃসাহস, অপ্রতিরোধ্য, বজ্র-ক্ষিপ্র অনির্বাণ
ডাকছে তোমায় শহীদি কাফেলা, ডাকছে ঐ ময়দান।

মালী এবং স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ

ডা. ইয়াদ কুনেবী

সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা এখন কিছু সময়ের জন্যে মালীর মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্ব অভিযানের ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট পর্যালোচনা করব–

মালীর ইতিহাস

মালী ইসলামের এক প্রাচীন রাজধানীর অন্যতম, প্রায় ৯০০ বছর আগে তিমবাক্তুর ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যা এই বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত-র্ভূক্ত।

মালী মুসলিম দেশগুলোর আলোতে আলোকিত হতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাংঘাই সাম্রাজ্য এর অন্ত-র্ভূক্ত হয়ে যিনি মরক্কোর সুলতান ছিলেন যার ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ-১ এর সাথে মিত্রতা ছিল অথচ এরা ১৫৯১ সালে আগ্রাসন চালায় সভ্যতা ধ্বংস করে এবং এর জনগণ এবং বিজ্ঞানীদের দাস-দাসী বানানোর মাধ্যমে যেমন– আহমেদ বাবা আলতেনেবক্টা।

যা বেশির ভাগ লোকেরা জানে না তা হলো মালী এবং অন্যান্য আফ্রিকার দেশগুলোর এক নির্দিষ্ট সংখ্যককে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা জবরদস্তি করে দাস বানিয়ে রাখে যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত এবং যাদের অনেকে মুসলিম আলেম ছিলেন যেমন- সেনেগালের ওমর বিন সাঈদ যিনি ১৮৬৪ সালে মারা যান এবং যার ছবি এখনও আমেরিকার ঐতিহাসিক আর্কাইভে রয়েছে।

ফরাসীদের দ্বারা মালী দখল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্স যখন মালী দখল করে এবং নারকীয় অপরাধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং তারা এখানে তাদের দালালদেরকে ব্যবস্থায় বসিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত তারা ছেড়ে যায়নি যেনো এই অঞ্চলে তাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং এর সম্পদগুলো আহরণ করা যায়। এই প্রশাসনগুলোর মুসলিমদের ওপর ধারাবাহিক নির্যাতন চলতে থাকে বিশেষত উত্তর মালীর তুরেগ আরব আল্যাটোয়েন এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর।

স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনের প্রকৃতি

তারপরে স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে এবং উন্নততর জীবন যাপনের জন্যে কিছু উদারপন্থী আন্দোলন জেগে ওঠে। কিন্তু এই আন্দোলনগুলো ইসলামিক ছিল না যার ফলে তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনুসরণ শুরু করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনায় বসার এবং অন্তর্ভুক্তির দিকে ধাবিত হয়। এই আলাপ আলোচনাগুলো সবসময়ই পুতুল কেন্দ্রীয় সরকারের করা কিছু প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শেষ হত যার ভাওতা খুব শীঘ্রই ধরা পড়তো।

পরবর্তীতে তুরেগ দলগুলোর মাঝে ইসলামের পুনর্জাগরণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে যার লক্ষণ ধরা পড়ে এবং তাদের স্বপ্ন প্রদর্শিত হতে থাকে এবং তারা শিখে যে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন ব্যতীত জনগণের কোন মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যা এই এক কথার উপর এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্খায় এবং ফ্রান্সের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্যে এবং পুতুল কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত দুর্নীতি এবং যন্ত্রণার ইতি টানার জন্য এবং মুসলিমদের দুনিয়া এবং আখিরাতের মঙ্গল অর্জনের জন্যে এখানকার ধার্মিক সন্তানদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

আনসার আদ-দ্বীনের যাত্রা

এই দলগুলোর মধ্যে একটি ছিল আনসার আদ-দ্বীন যার নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াদ ঘালী (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন) যিনি কূটনীতি এবং মালী, সৌদিআরবের রাষ্ট্রের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করেন এবং পরে তিনি এগুলো করে ব্যর্থ হওয়ার পর অন্যান্য মুসলিম দলগুলোর সাথে মিত্রতা করে জামা'আত আনসার আদ-দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের সবারই আকাঙ্খা ছিল শরীয়াহ বাস্ত-বায়ন করা এবং ফ্রান্সের এবং তাদের দালাল সরকারগুলোর প্রভাব থেকে মালীকে স্বাধীন করা।

জামা'আত আনসার আল-দ্বীনের বইপত্রসমূহ আক্বিদাহ এবং মানহাজের বিশুদ্ধতায়, উত্তীর্ণ। সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিজ্ঞতা, দয়া এবং স্থায়িত্ব এবং বাস্ত-বিকতা যা এই দলের এক দক্ষ নেতৃত্বের পরিচয় বহন করে এবং এই সব বাস্তবতা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বড় আলেমের উপস্থিত প্রতিয়মান করে এবং সামর্থের কমতি থাকার পরও ঐক্যবদ্ধের উপস্থিতি, সভ্যতার পরিকল্পনাও একই বিষয় ফুটিয়ে তোলে (সুবহানাল্লাহ)।

আনসার আদ-দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যা খুব পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সান্দ ওয়ালিদ বু'আমামা এর সাক্ষাৎকারে- দলটির মুখপাত্র যা আনসার আদ-দ্বীনের লক্ষ্যগুলোকে ফুটিয়ে তোলে...

ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা এবং এই জমিনে আমাদের হাতেই বিভিন্ন পরিসরে ইসলামী জীবন পুনরাম্ভ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং ওকালতি, পরামর্শ এবং ইসলামী নৈতিকতা, মুসলিমদের সঠিক বিশ্বাস এবং তাদের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা এবং তাদের কুফরের আহ্বানকারী, তাদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করা, গ্রাম্য এবং মফস্বল এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করা এবং জনগণের নূন্যতম চাহিদা পূর্ণ করে চলা এবং লোকদের শিল্প কারখানার পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা এবং তাদেরকে বুঝানো যে এগুলোতে অবদান রাখা ইবাদতেরই অংশ, যা মুসলিমদের কার্য সম্পাদনে, টিকে থাকতে এবং ধৈর্য্য ধরতে খুবই প্রয়োজনীয়।

আনসার আদ-দ্বীনের সাথে সংলাপে বসতে অস্বীকৃতির কারণ

এখানে আমরা এ ধরনের নৃশংসতা এবং রক্তপাতের ব্যাপারে এবং আনসার আদ-দ্বীন এবং তাদের সহযোগীদের সাথে আলোচনা প্রত্যাখ্যানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনায় আসতে পারি। সাবেক ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ওয়াশিংটনের হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে ০৫.১০.২০০৫ সালে চার্লস ক্লার্ক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে বক্তৃতায় বলে–

'এই সন্ত্রাসীদের যা উদ্বুদ্ধ করে তা হল আদর্শ। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের যেসব অংশে স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন জেগে ওঠে তার বেশির ভাগ ছিল রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। যেমন– স্বাধীনতা, সাম্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা এ ধরণের লক্ষ্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করা যায় এবং হয়েছেও। কিন্তু খেলাফতের পুনঃস্থাপন? শরীয়াহ বাস্তবায়ন আলাপ আলোচনার বিষয় নয়। লিঙ্গ-বৈষম্য কোনো আলাপ আলোচনার বিষয় নয় এবং আমাদের কাছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কোনো আলাপ আলোচনার বস্তু নয়। এই নীতিগুলো আমাদের সভ্যতার ভিত্তি যা সাধারণভাবে আলাপ আলোচনার জন্যে নয়।'

সম্পূর্ণ রূপে তার মতই, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী অভিযান চালু হওয়ার পরে বলেন– 'আলাপ আলোচনা করা? উত্তর মালী দখলকারী সন্ত্রাসীদের সাথে। শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন... হাত কেটে ফেলা এবং দালান ভাঙা, মানুষের উত্তরাধিকার বিবেচনা করা... (সে মাজারগুলোর দিকে ইংগিত করছে যা আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হতো)'

অবশ্যই আমার ভাইয়েরা, সে সুস্থ মস্তিষ্কে ফিরে আসেনি, সে সতর্কতার সাথে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ধোঁকা দিল নারী অধিকার আর এরাই সিরিয়ায় তাদের অধিকার হরণ করে চলছে ২ বছর ধরে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা কথা বলে অথচ সিরিয়ানদেরকে ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে! এই শ্লোগানগুলো এখন এরা আওড়াচ্ছে অথচ আমরা দেখি বার্মার মুসলিমদেরকে জীবিত পুড়িয়ে ফেলা এবং কেটে ফেলা হচ্ছে।

সুতরাং বিষয়টি একদম স্বচ্ছ। আন্ত-র্জাতিক সম্প্রদায় কখনও পৃথিবীর কোন জায়গায় শারীয়াহ আইন বাস্তবায়নের ধারণা লালন করতে দিবে না। এই আদর্শ আলাপ আলোচনা বা, মিমাংসার জন্য নয়। কারণ এর মানে হলো এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাস্তবায়ন করা যা এই মানবতা এবং দীর্ঘকাল যাবৎ চাপিয়ে দেয়া পুঁজিবাদ এবং লালসার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের জরুরি চাহিদা এবং কারণ এর মানে হল মিডিয়া যন্ত্র অথবা, মিডিয়া দেবতার জাদুর অবসান হওয়া যা এত দিন ধরে শরীয়াহের ধারণা বিকৃত করে আসছে।

শরীয়াহ দ্বারা শাসন

ফলশ্রুতিতে আনসার আদ-দ্বীনে আমাদের ভাইয়েরা এমন এক এলাকা তৈরি করেন যেখানের নিরাপত্তা, লোকদের মধ্যে রাহমাহ ছিল বিস্তৃত এবং কর প্রদান এবং সম্পদ আত্মসাৎ স্থগিত হয় এবং তা যথাযথভাবে বন্টিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের তাদের অধিকার দেয়া হয় এবং নিজেদের ওপর দুর্বলদের অনুগ্রহ করা হয়।

মালি ভূখণ্ডের এই সাফল্য সে এলাকার লোকদের কাছে এক উদাহরণ হয়ে ওঠে মানব রচিত বিধানের তুলনায় যা এই মানবতাকে বিভিন্ন বেদনার বিষ এবং বিপর্যয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে।

মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা

একই পথের পথিক আরবের প্রশাসনগুলোও সাফল্যের এই উদাহরণের স্বাক্ষী হয়নি যা আত্মসম্মান তালাশকারী লোকদের জন্যে এক মশাল এবং উদাহরণ হয়ে ওঠে এবং শাসকদের মিথ্যাগুলোকে, ওয়ালী আল' আমরের ফাতোয়া এবং উন্মোচন করে, নাজুকতার পর্যায় এবং উপকার ও অপকার। এখনকার আগে কখনও এরকম উন্নততর অবস্থা ছিলো না! অতঃপর তারা বিদ্বেষপূর্ণ প্রতারণা এবং আনসার আদ-দ্বীনের বিপক্ষে ফ্রান্সের সাথে দুষ্কর্মে মেতে ওঠে। মুসলিমদের ধনী দেশগুলো বোকামীতে তাদের তহবিল বিনষ্ট করছিল যখন মালির মুসলিমরা মারা যাচ্ছে এবং অন্যান্যরা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে।

আমি সাম্প্রতিক মানচিত্রে তাদের অবস্থান অনুধাবন করি, তারা তাদের সাহায্যের জন্য কোনো অর্থই খরচ করেনি কিন্তু তার উল্টো তারা ফ্রান্সকে সাহায্য করেছে তাদের হত্যা করতে এবং এর মাধ্যমে এরা তাদের ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিয়েছে! এবং কিছু আন্দোলন ছিল যারা গণতন্ত্রের পথে হেঁটে চলতো যেমন তিউনিসিয়া যারা তাদের আকাশ সীমা খুলে দিয়েছিলো এবং ক্রুসেডারদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে আসছিলো তারাও যুদ্ধ করে যাচ্ছিল এমন সব ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যারা সৎভাবে শরীয়াহ প্রয়োগ করছিলো ও এর জনগণের চোখ খুলে দিচ্ছিল যা তাদের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিচ্ছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবদান

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, যারা মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়ার বিপ্লবের নিজ দেশীয় হওয়াকে তত্ত্বাবধান করছিল এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করছিল কারণ এরা দেখলো যে এদের চাহিদাগুলো সংলাপের মুখাপেক্ষী একই সম্প্রদায় প্রচণ্ড ও রক্তিম কাজ করে যাচ্ছিলো, মালীতে সংলাপ প্রত্যাখ্যান যা তারা এর আগে আফগানিস্তান এবং সোমালিয়ার ক্ষেত্রেও করেছিলো। সুতরাং, এই হল সেই কোন যে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় তার জন্য।

সংলাপের ব্যাপারে আনসার আদ-দ্বীনের মুখপাত্রের বক্তব্য

আনসার আদ-দ্বীনের মুখপাত্র সান্দ বু'আমামা বলেন, 'আনসার আদ-দ্বীন জবরদস্তির মুখে পড়ে সংলাপের পথ বেছে নিয়ে ছিল এবং এমন সমাধানে যেতে চাচ্ছিলো এমন যে কোনো দলের সাথে যার কোন নেতিবাচক প্রভাব যেনো এই ভূমিতে না পড়ে, এতে শুধু একটাই শর্ত ছিলো যে এটাকে কোন ভাবে ছাড় দেয়া যাবে না এবং এটা কোনো হোঁচট খাওয়ার পাথরে পরিণত হওয়া উচিত নয় যেনো আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে দর কষাকষি যেনো না হয় অথচ এর জন্যই আমরা অস্ত্র ধরেছি এবং এর জন্যই আমরা যুদ্ধ করি এবং

এটা ছাড়া আর যেকোনো ব্যাপারে আমরা আলোচনা করতে রাজি আছে এবং তর্কেও প্রস্তুত যার মধ্যে জনগণের জন্য দয়া এবং আল্লাহকে দেয়ার মতো অজুহাত থাকবে এবং নতুন আসা মুজাহিদীন ভাইদের প্রতিও দয়া করা যাবে।' তাঁর কথা এখানেই শেষ, (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন)

কিন্তু সংলাপে আসা দলটি সংলাপের জন্য আগে থেকেই আলজেরিয়াকে মধ্যস্থতার জন্যে সুপারিশ করছিল তারা ভালোভাবেই জানত যে আলজেরিয়া তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং এর নীতি প্রণয়নের শেষ অংশ হতে যাচ্ছে। কিন্তু আনসার আদ-দ্বীন পার্শ্ববর্তী শত্রুভাবাপন্ন প্রশাসনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভব সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু আন্ত-র্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি হলো এমন যে আল্লাহর দ্বীন দিয়ে শাসন করা খুব স্বাভাবিকভাবেই সংলাপ গ্রহণ করে না।

যুদ্ধের শুরু

তারপর যুদ্ধ শুরু হলো এবং মুজাহিদীনরা বদান্যতা দেখিয়ে কিছু শহর থেকে বেরিয়ে আসলেন কারণ ক্রুসেডার এবং সাঙ্গপাঙ্গরা মুজাহিদীনরা যতক্ষণ যেখানে তাকবেন ততক্ষন পর্যন্ত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বোমা ফেলতে থাকবে এবং এর আগে আফগানিস্তান, সোমালিয়া, নাজেরিয়া, চেচনিয়ায় যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিলো তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। যখনই উর্দি পরা সেনারা ঢুকতো পুরো শহর মুজাহিদীনদের আগলে রাখত এবং সেনাদল তখন তাদের উপরেই হামলে পড়তো এবং জনগণকে রাস্তায় রাস্তায় হত্যা করা হতো, ইজ্জত-সম্মান হরণ করা হতো এবং মুজাহিদীনদের সমর্থন করাই তাদের মৃত্যুর কারণ হত।

দখলদারিত্বের পরিণতি

কিন্তু আমার ভাইয়েরা, পশ্চিম মালীতে কালোদের গোলামীর শিকল পর্যালোচনা করার পরে পুতুল সরকার কর্তৃক তুরেগ এবং আরবদের হত্যাযজ্ঞ এবং সাধারণভাবে জনগণের সাথে আচরণে দূর্নীতি যখন মালীর মুসলিমরা কিছু মাস শরীয়াহর নিচে থাকার মিষ্টতা পেয়েছে তখন মালীতে ইসলামী ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার অভিযানের ব্যাপারে সফলতা আশা করা যায় না যদিও আনসার আদ-দ্বীন এবং অন্যান্য ইসলামী দলের সাধারণ মেম্বাররা মিটে যায় মালীর মহিলারা যারা মর্যাদাকে বেছে নিয়েছে তারা বীরপুরুষদের জন্ম দিতে থাকবে। সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের এটা এক নতুন অঞ্চল সুতরাং এই লড়াই এবং যুদ্ধ চলতে থাকবেই যতক্ষণ না তিনি হক্বের দ্বারা বাতিলকে দূরীভূত করেন এবং বাতিল মিলাবেই আর আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের আগ্নেয়গিরির উদগীরণ হবেই।

১১ বছর আগে যখন বিশ্ব আফগানিস্ত-ানে দখলদারিত্ব চালালো আমরা ঠিক তেমনি চিন্তা করছিলাম যা বেশির ভাগ মুসলিমরা চিন্তা করছিলো যে আল্লাহ যথাশীঘ্রই এই বিষয়ের সমাধান করবেন এবং তালেবানে তার বান্দাদের সাহায্য করবেন। তারপরে হঠাৎ শহরগুলোর পতন শুরু হলো এবং মুজাহিদীনদের পাকড়াও করা হলো আসির হিসেবে এবং হাজারে হাজারে হত্যা করা হলো এবং বেদনাদায়ক ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়লো। যেমন এক মুজাহিদের ছবি যাকে নর্দার্ন এলাইয়েন্স কোয়ালিশন- উপত্যকা থেকে বের করে আনলো যিনি কাবুলের সীমান্তে আগলে রেখেছিলেন এবং তাঁকে গুলি করে তারা তার পেটে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলো পরে তাঁকে মাটিতে টানা হেঁচড়া করা হলো পরে তারা ঐ সম্মানিত ভাইয়ের পেন্টগুলো ফেলে এবং চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়। এই ছবিগুলো আমাদেরকে স্তম্ভিত করছিলো কারণ আমরা আল্লাহর সুন্নাহকে বুঝে উঠতে পারিনি তার বান্দাদের পরীক্ষা করার বিষয়ে, তাদের শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে এবং তাদের থেকে শহীদ হিসেবে কবুল করার বিষয়টা।

এটা থেকে অনেকেরই মনে হচ্ছিল যে আল্লাহর দ্বীন মনে হয় এই জমীনে আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না পরে আজকে আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি যে পুরো দুনিয়া আফগান মুজাহিদীনদের সংলাপের টেবিলে এক বছর আগে ১৩৯টি দেশ বন কনফারেন্সে আমন্ত্রণ করেছে পরের বছরে আন্তর্জাতিক সেনা সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করার পরে তাদের দুর্দশা নিয়ে মুজাহিদীনদের সাথে বৈঠকে বসতে চাচ্ছে এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন মুজাহিদীনদের অটল রাখেন তারা যেন শরীয়াহ বাস্ত-বায়নের মূল্যে কোন ধরনের সংলাপ পরিত্যাগ করেন। বিগত ১১ বছরে হয়ত তালিবানদের আরো অনেক সদস্যই শহীদ হয়েছেন কিন্তু তাদের রক্তের বিনিময়ে তারা অনেক আফগান জনতার অন্তরে স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ এবং শরীয়াহর প্রতি ভালোবাসা প্রজ্বলিত করেছেন।

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন যে তিনি তার সাধারণ বান্দা মুজাহিদীনরা তার পথে থাকেন তবে তারা যে মশাল জ্বালিয়েছেন তা কখনো নিভে যাবার নয় ইনশা-আল্লাহ যতক্ষণ এর জ্বালানি মুসলিম অন্তরের ফিতরাতে নিমজ্জিত থাকবে এবং আমরা গর্বের আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাত ঘটিয়ে যাবো যার মাধ্যমে অত্যাচারী শাসক এবং মানবতার শত্রুদের পায়ের তলার মাটিকে জ্বালিয়ে দিবো এবং আমাদের প্রজ্জীবিত নেতৃত্ব মুসলিমদের নতুন বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবে।

মুসলিমদের প্রতি আহ্বান

সুতরাং আমাদের মধ্যের প্রত্যেকে যেনো তার নিজের জন্য এই মশালের নিচে তার স্থান খোঁজে নেয় কারণ যে একটা ভালো তীর দিয়ে শামিল হবে তার জন্যেও অভিনন্দন রয়েছে এবং যে এই মশালের আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চাবে তাহলে জেনে রাখা উচিত আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণতা দিবেন যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে এবং যে এই অবস্থায় শুধু দেখেই গেলো সে যেনো আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কোনো উত্তর দেয়ার প্রস্তুতি নেয়।

চলেন আমরা এই ক্রুসেডের সত্যতা সবার কাছে তুলে ধরি এবং আমাদের মধ্য থেকে যার এর সাথে শামিল হয়েছে তাদের প্রতারণা এবং আমাদের নিজেদের বাবা, মা, ভাইদের যে অধিকার রয়েছে একজন আরেকজনের প্রতি একই অধিকার রয়েছে। দ্বীনের এই ভ্রাতৃত্ববোধ এর ভিত্তি হলো রক্তের ভ্রাতৃত্ব বোধের চেয়েও পবিত্র।

সিরিয়া : অতীত ও বর্তমান

মুফতি আহমদ আলী

আরবদের কাছে সিরিয়া এলাকা ‘বালাদে শাম’ বলে পরিচিত। পবিত্র কোরআনে সুরা রুমের সেই “ফি আদনাল আরদি” বা নিকটতর নিম্ন এলাকার দেশ হলো সিরিয়া। ইসলাম ও প্রাক ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলো এই ভূমিতেই সংঘটিত হয়েছিলো। যেমন ইরানীদের সাথে গ্রীক ও রোমানদের, খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলিমদের। সিরিয়ার ভূমিতেই মুসলিমরা তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমানদের পরাজিত করে প্রধান বিশ্বশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়। সালাউদ্দিন আয়ুবী এ ভূমিতেই ইউরোপীয় ক্রুসেডার বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। বাণিজ্যিক দিক থেকেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত শত শত বছর ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথগুলো ছিল সিরিয়ার মধ্য দিয়েই। চীন, ইরান, ভারত, ইয়েমেন এবং মধ্য এশিয়া থেকে বাণিজ্য বহরগুলো সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোতে এসে ইউরোপগামী জাহাজে উঠতো। তেমনি ইউরোপীয় পণ্য এ পথ ধরেই এশিয়ার বাজারে ঢুকতো। ইতিহাসে এ বাণিজ্যপথ ‘সিল্ক রোড’ নামে খ্যাত। রোমান সাম্রাজ্যের রাজস্বের বিশাল ভাগ আসতো এ বাণিজ্য বহর থেকে। এখান থেকেই বিপুল অর্থ জমা হতো উসমানিয়া খেলাফতের অর্থভাণ্ডারে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় সিরিয়া ছিলো অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) খাদিজা (রা.) এর বাণিজ্য বহর নিয়ে সিরিয়াতে এসে বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

সিরিয়ার ওপর দখলদারি প্রতিষ্ঠাকে অতীতে প্রতিটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই গুরুত্ব দিতো। ইসলামের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, সিরিয়ার ওপর দখলদারিত্বে যারা সফল হয়েছে তারাই মুসলিম উম্মাহর উপর শাসক রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মোয়াবিয়া (রা.) এর রাজনৈতিক শক্তি এবং তার হাতে উমাইয়া রাজবংশ গড়ে উঠার মূল কারণ, সিরিয়ার ওপর তাঁর দখলদারিত্ব। দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর থাকার কারণে সহজেই তিনি নিজের পক্ষে বিশাল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম এ তিনটি ধর্মের প্রধান লালনভূমি হল সিরিয়া। অপরদিকে আরব জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি যেমন সিরিয়া, তেমনি আরব সোশালিস্টদের কেন্দ্র ভূমিও হলো সিরিয়া। তেমনি কেন্দ্র-ভূমি হলো ইসলামপন্থীদেরও। নাসিরুদ্দিন আল-বানীর মতো স্কলার ও ইমাম তায়মিয়ার মতো মোজাদ্দেদগণ সিরিয়া থেকেই মুসলিমদের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করেছিলেন।

অসংখ্য হাদিসে শামের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর শাম বলতে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন ও ইসরাইল এলাকাকে বুঝানো হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

‘যখন শামবাসী ধ্বংস হবে তখন আর তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না।’ (তিরমিজি ২১৯২; মুসনাদে আহমদ ১৫৫৯৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩৪০; ইবনে হিব্বান ৭৩০২) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

:

:

‘নিশ্চয় তোমরা বিভিন্ন সেনাদলে বিভক্ত হবে। একটি শামদেশে, একটি ইরাকে, আরেকটি ইয়ামানে। (হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে হাওয়ালা বলেন) আমি বললাম আমার জন্য একটি নির্বাচন করুন (যেটাতে আমার যোগদান করা উত্তম হবে)। তিনি বললেন, তুমি শামের সেনাদলকে আঁকড়ে ধর।’ (ইবনে হিব্বান ৭৩০৬; আবু দাউদ ২৪৮৫; মুসনাদে আহমদ ২০৩৬৯) অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

-

-

‘মাসিহ দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে বের হয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যখন ওহুদের পাদদেশে পৌঁছবে তখন ফেরেশতারা তাকে শাম দেশের দিকে ঘুরিয়ে দিবে এবং সেখানেই সে ধ্বংস হবে।’ (মুসলিম ৩৪১৭; তিরমিজি ২২৪৩) অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

-

-

‘(দাজ্জালের সাথে) যুদ্ধের সময় মুসলিমদের আশ্রয়স্থল হবে ‘গুত্বা’

নামক স্থান, যা শাম দেশের শহরসমূহের মধ্যে উত্তম শহর দামেশকের সন্নিকটে।' (আবু দাউদ ৪২৯৮; মুসনাদে আহমদ ২১৭৭৩)

ঔপনিবেশিক শক্তির কবলে পড়ে সিরিয়া বিভক্ত হয়েছে ৫ টুকরোয়। তুরস্কের ইসলামী সাম্রাজ্য (ওসমানিয়া সাম্রাজ্য) ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বড় বাধা তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কারণে ব্রিটিশ শাসকরা এই সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, সৌদি আরব ইত্যাদি অসংখ্য তাঁবেদার রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। 'দি আরবস' বইয়ের লেখক বিবিসি সংবাদদাতা পিটার ম্যান্সফিল্ড লিখেছেন, কায়রোর এক চায়ের টেবিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক কলমের খোঁচায় জর্ডান নামের এক রাষ্ট্রের জন্ম দেন। অথচ এমন একটি রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি যেমন ছিলো না, প্রয়োজনও ছিলো না। কিন্তু সে রাষ্ট্র নির্মাণ প্রয়োজন পড়ে এই এলাকার ওপর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি প্রতিষ্ঠা ও সেটিকে স্থায়িত্ব দেয়ার স্বার্থে। সে লক্ষ্য পূরণে ইসলামের শত্রুপক্ষ সিরিয়াকে ৫ টুকরোয় খণ্ডিত করেও খুশি নয়। ষড়যন্ত্র করছে আরো বহু টুকরোয় খণ্ডিত করার। পাশ্চাত্য মিডিয়ায় এই বিভক্তির পক্ষে বার বার ওকালতিও করা হচ্ছে। কারণ, দেশটির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধের সামর্থ্যে তারা প্রচন্ড ভীতু। সিরিয়া একাই ইসরাইলের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ খাড়া করতে সক্ষম। সিরিয়ায় ইসলামী শক্তির বিজয় হলে সে শক্তি যে বিপুলভাবে বাড়বে সেটি ইসরাইলসহ কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই অজানা নয়। তখন শুরু হবে ইসলামী জনতার লাগাতার জিহাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সিরিয়াকে অধিকৃত করার পর দেশকে খণ্ডিত করা হয় পাঁচ টুকরায়। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিলো, সিরিয়া অখণ্ডিত থাকলে সেখান থেকেই উদ্ভব হবে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের। জন্ম নিবে আরব ঐক্য। তাছাড়া সিরিয়াকে বিভক্ত করা জরুরি ছিল ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রতিরক্ষাকে নিশ্চিত করার স্বার্থেও। সিরিয়ার একাংশকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিষ্ঠা করে ইসরাইল। খণ্ডিত অপর চারটি টুকরা হলো, (বর্তমান) সিরিয়া, লেবানন, জর্দান এবং ফিলিস্তিন। পাঁচ টুকরোয় বিভক্তির পরও ক্ষুদ্র ফিলিস্তিনকে অখন্ড রাখা হয়নি। এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে বিভক্ত করেছে গাজা ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের অংশের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে একই রূপ অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ট্রাজেডির শিকার হয়েছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সুদানের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মুসলিম ভূমি। আজ বিভক্ত করা হচ্ছে ইরাককে।

রাজনৈতিক দখলদারি এবং অর্থনৈতিক শোষণের জন্য কোনো জাতিকে স্থায়ী ভাবে পঙ্গু বা দুর্বল করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো ঐ জাতিকে ভৌগলিক বিভক্তিকরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সিরিয়াকে অধিকৃত করার পর দেশটিকে পাঁচ টুকরোয় খন্ডিত করা হয়। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল, সিরিয়া অখণ্ডিত থাকলে সেখান থেকেই উদ্ভব হবে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের। জন্ম নিবে আরব ঐক্যের। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর সিরিয়ার মূল অংশের ওপর দখলদারি দেয়া হয় ফ্রান্সকে। দেশটিতে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর ফ্রান্সের শাসন বলবত থাকে। ফ্রান্স তার ২৭ বছরের শাসনকালে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করা জন্য ভৌগলিক বিভক্তি বা অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি যে বড় ক্ষতিটা করে তাহলো সেক্যুলারাজিম ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে। তবে ভৌগলিক বিভক্তি টিকসই করার মোক্ষম মাধ্যম হলো, সে দেশের জনগণের মাঝে গভীর ঘৃণা এবং সে ঘৃণার ভিত্তিতে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের জন্ম দেয়া। দখলদার ফ্রান্স প্রশাসন সিরিয়ায় সেটিই করেছে। ফল দাঁড়িয়েছে, হাজার বছরের অধিক কাল ধরে সুন্নী, শিয়া, খ্রিস্টান, দ্রুজ, তুর্কমান, কুর্দি যে সিরিয়াতে একসাথে বসবাস করে আসছিল ফ্রান্সের মাত্র ২৭ বছরের শাসনে সেটি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘৃণার যে আগুনে অবিরাম জ্বলছে লেবানন, এখন সে আগুন সিরিয়াতেও ছড়িয়ে দিতে তারা ব্যস্ত। আর সে আগুনের ফেরি করছে ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থি নাস্তিক ও সেক্যুলারিস্টরা। মুসলিম দেশগুলো ভাঙতেই তাদের আনন্দ, এক সাথে থেকে সমস্যা সমাধানে বা দেশ গড়াতে নয়। তাই মুসলিম দেশগুলো যতই বিভক্ত হয়েছে ততই বেড়েছে তাদের বিজয়োৎসব।

সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ হল সুন্নী। শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ আলাভী শিয়া এবং শতকরা ১০ ভাগ খ্রিষ্টান। অথচ ফরাসীদের শাসনামলে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অফিসার রূপে যাদের নিয়োগ দেয়া হয় তাদের অধিকাংশই হল আলভী শিয়া এবং পরিকল্পিত ভাবে দূরে রাখা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদের। বর্তমান শাসক বাশার আল-আসাদের পিতা হাফিজ আল-আসাদ ছিলেন আলাভী শিয়া (অবশ্য অনেক শিয়াও আলাভীদের মুসলিম মনে করেন না)। ফলে সেনাবাহিনীতে তাঁর প্রবেশ ও সেনাবাহিনীতে তার দ্রুত প্রমোশনও সহজ হয়ে যায়। শুধু সিরিয়ায় নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সর্বত্র একই কৌশল। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর শাসন করতে তারা কোয়ালিশন গড়ে সংখ্যালঘুদের সাথে। অধিকৃত বাংলায় একই রূপ কুকর্ম ঘটিয়েছিলো ঔপনিবেশিক ইংরেজরা। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হলেও, দেশ শাসনে তারা নাপাক হিন্দুদেরকেই পার্টনার রূপে বেছে নিয়েছিলো। তাদের হাতে তুলে দেয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিদারি। অন্য দিকে এক শ্রেণীর গোঁড়া ও অদূরদর্শী মৌলভীদের ব্যবহার করে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে মুসলিম সমাজকে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা ও ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সিরিয়াতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফ্রান্সের নীতি হয়ে দাঁড়ায় মুসলিমদেরকে দ্রুত দরিদ্র ও দুর্বল করা ও আলাভীদেরকে ক্ষমতাশীল করা। সে সাথে শুরু হয় আধুনিকতার নামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। ফলে সিরিয়ার উপকূলীয় নগরী লেবাননকে পরিণত করা হয় সমগ্র আরব ভূমিতে মদ্যপান, নাচ-গান, উলঙ্গতা, অশ্লীতা ও ব্যভিচারের প্রধানতম কেন্দ্রে। যার নাম হয়েছিল প্রাচ্যের প্যারিস!

হাফিজ আল-আসাদ ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর। তাঁর মৃত্যু হয় ২০০০ সালে। ক্ষমতায় বসানো হয় তাঁর পুত্র বাশার আল-আসাদকে। হাফিজ আল-আসাদ তার তিরিশ বছরের শাসনে মুখে আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে সিরিয়ার অধিকাংশ লোকদের ধোঁকা দেয়। মূলত তার আসল লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার ওপর আলাভী শিয়াদের গোত্রীয় শাসনকে সুদৃঢ় করা এবং সে সাথে নিজ পরিবারের রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দেয়া। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আলাভীদের নিয়োগ দেয়া হয় এবং মৃত্যুর পর নিজ পুত্র বাশারকে পরবর্তী শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেয়। মিশর, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন বা লিবিয়ার স্বৈরাচারী শাসকবর্গ সেনাবাহিনী থেকে তেমন সমর্থন পায়নি বলে পরিবর্তন এসেছে দ্রুত কিন্তু সিরিয়ার ব্যাপারে তা হচ্ছে না। কারণ সিরিয়ার সেনাবাহিনীর জনবল প্রায় ৪ লাখ। অফিসারদের অধিকাংশই আলাভী, ফলে চলমান বিপ্লব দমনে বাশার পাচ্ছে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের পূর্ণ সমর্থন। সেনাবাহিনীর ট্যাংক, দূরপাল্লার কামান, হেলিকপ্টার গান-শিপ ও বোমারু বিমান ব্যবহৃত হচ্ছে নগর ও গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। জনগণের রক্ত ঝরাতে সেনাবাহিনী একটুও পিছুপা হচ্ছে না। জনগণের অর্থে কেনা গুলি ব্যবহৃত হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অবধি ২৬ হাজার সিরিয়াবাসীর মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিক এক হিসেবে জানা যায়, এ পর্যন্ত ঘরবাড়ি ধ্বংসের ক্ষতির পরিমাণ ৩৬.৫ বিলিয়ন ডলারের উর্ধ্বে ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এ বিপ্লব আরও রক্তাক্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিন লাখ সিরিয়ান উদ্বাস্তু রূপে আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী জর্ডান, তুরস্ক, লেবানন ও ইরাকে। প্রতিদিন শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে হাজার হাজার মানুষ।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সিরিয়ানদের কোরবানী ছিল অনন্য। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পিতা হাফিজ আল আসাদের শাসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে একমাত্র হামা নগরীতে প্রাণ দিয়েছিলো প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। স্বৈরাচারী হাফিজ আল-আসাদের ট্যাংক বাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছিলো এ নগরীর বিশাল অংশ। এ কারণেই ইসরাইল ও মার্কিনীদেরও বড় ভয় হলো এই সিরিয়া। ফলে সিরিয়াতে আজ যে বিপ্লব শুরু হয়েছে সেটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে না গিয়ে দিন দিন রক্তাক্ত হচ্ছে। আন্ত-র্জাতিক চক্র ব্যস্ত দেশটিকে আরও দুর্বল করা নিয়ে। এ বিষয়টি আরব বিশ্বের ইসলামের পক্ষ শক্তি যেমন বুঝে তেমনি ইসলামের শত্রুপক্ষও বুঝে। তাই সিরিয়ার চলমান লড়াইটি আজ আর শুধু সিরিয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেখা যায় পাশের দেশের মুসলিম যুবকরাও এসে শামিল হচ্ছে এ সংগ্রামে। স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে বিশেষ করে দুর্বৃত্তদের প্রভাব মুক্ত স্বাধীন ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়েই শুরু হয়েছিলো এ সংগ্রাম। দিন দিন তা ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যাকে থামানো কঠিন হবে সাম্রাজ্যবাদীর কুফুরি শক্তির পক্ষে। এ বিপ্লব যতই তীব্রতা পাচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে আধিপত্য-বাদী ইয়াহুদি ও সাম্রাজ্যবাদীদের। দুশ্চিন্তা বাড়ছে সেক্যুলারিস্ট, সোশালিস্ট ও ন্যাশন্যালিস্টদেরও। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ লড়াই পরিণত হচ্ছে এক নির্ভেজাল ইসলামি জিহাদে।

সিরিয়ার জনগণের কাছে এটা এখন পরিষ্কার যে পশ্চিমা শক্তিরা চায় সিরিয়াতে স্বৈরাচার বিলুপ্ত হয়ে এমন কেউ আসুক যারা তাদের কথামত চলবে। তাই হয়তো বা তেমন কাউকে না পাওয়ায় তারা সাহায্য করতেও তেমন এগিয়ে আসছে না। ইউরোপ আমেরিকার ক্ষমতাসীনরা মন থেকে চায় না দেশটিতে ইসলামের পক্ষের শক্তির বিজয় হোক। বাশার আল-আসাদের ইরানের সাথে বন্ধুত্ব নিয়ে তাদের আপত্তি থাকলেও তাঁর সেক্যুলারিস্ট নীতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রেম নিয়ে তারা প্রচণ্ড খুশি। ৯/১১ এর পর টেরোরিষ্ট সন্দেহ করে মার্কিনীরা যাদেরকে নানা দেশ থেকে গ্রেফতার করতো তাদের রিমান্ডে পাঠিয়ে নৃশংস অত্যাচারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়ায় পাঠানো হতো। মার্কিনীরা এমন কুকর্মকে 'রেন্ডিশন' বলে থাকে। এমন এক তাঁবেদার স্বৈরাচারের বদল কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেনে স্বৈরাচারী শাসনের বিলুপ্তিতে তারা আদৌ খুশি নয়। তারা ছিলো তাদের পরম মিত্র। তাই চক্রান্ত হচ্ছে ইসলামের নামে বদনাম ছড়াতে। জঙ্গিবাদের ধোঁয়া এখানেও তোলা হচ্ছে। ন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম যুবকদের ত্যাগ ও কুরবানিকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ হিসেবে পরিচিত করার জন্য পশ্চিমা মিডিয়াগুলো উঠে পরে লেগেছে। তবে আরব দেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন। সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষিদের তারা ভালোভাবেই চিনে ফেলেছে।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা বিপুল, সম্পদও বিশাল। কিন্তু যা নেই তা হলো সৎ নেতৃত্ব ও ইসলামের ন্যায় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ। সাম্রাজ্যবাদীরা চায় মুসলিমরা ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত থাকুক। কেননা এসব দেশে একটি সমাজ গড়ে উঠুক তা তাদের কাম্য নয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে আশাপ্রদ দিকটি হলো, মুসলিম দেশের যুব সমাজ এখন জেগে উঠেছে। নিজেদের সম্মান মর্যাদা পুন:উদ্ধারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাসদের দুর্বৃত্ত শাসন উচ্ছেদ করার সংগ্রামে যার শেষ হবে একদিন মুসলিম উম্মাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সে ভবিষ্যতবাণী আল্লাহর রাসুল করেছেন। সে দিন হয়তবা বেশী দূরে নয় ইনশা-আল্লাহ। আরব বিশ্বের সৌভাগ্য হলো সিরিয়ার জনগণ এখন মৃত্যুকে আর ভয় করে না এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহর সাহায্য আসলে কোনো বাঁধাই আর বাঁধা থাকেনা। তাই সরকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণে তাদের কণ্ঠ গর্জে উঠে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে। তাদের স্লোগান হচ্ছে 'মাআনা লা গাইরাক

ইল্লাল্লাহু’ অর্থাৎ ‘আমাদের সাথে আপনি ছাড়া কেউ নাই ইয়া আল্লাহ।’ সিরিয়ান বিপ্লবীদের আপলোড করা এমন একটি ভিডিও পাওয়া যাবে না যেখানে ‘আল্লাহু আকবর’ একাধিকার শুনা না যায়। এখানে লড়াই ভাষা, বর্ণ বা ভূমি নিয়ে নয়। এ লড়াইয়ে যারা প্রাণ দিচ্ছে তারা সেক্যুলার, সোশালিস্ট বা জাতীয়তাবাদীও নয়। বরং তারা প্রাণ দিচ্ছে ইসলামের বিজয়ের প্রতি গভীর অঙ্গীকার নিয়ে। তারা শুধু বাশারের পতনই চায় না, চায় শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। চায় আরব বিশ্ব এবং সে সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঐক্য। তাদের সে কথাগুলো আদৌ গোপন নয়। বাশার আল-আসাদের কাছে যেমন নয়, তেমনি পাশ্চাত্যের কাছেও নয়। ফলে এ বিপ্লব যতই তীব্রতা পাচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে আধিপত্যবাদী ইয়াহুদি ও সাম্রাজ্যবাদীদেরই। দুশ্চিন্তা বাড়ছে সেক্যুলারিস্ট, সোশালিস্ট ও ন্যাশনালিস্টদেরও। ইসলামের বিপক্ষ শক্তি চায় না সিরিয়াতে স্বৈরাচার বিলুপ্ত হোক। চায় না দেশটিতে ইসলামের পক্ষের শক্তির বিজয়।

বাশার আল-আসাদের ইরানের সাথে বন্ধুত্ব নিয়ে জনগণের আপত্তি। তাছাড়া সিরিয়ার সেনাবাহিনী মার্কিন বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধও করেছে। আল কায়েদার সদস্য সন্দেহ করে মার্কিনীরা যাদের নানা দেশ থেকে গ্রেফতার করতো তাদের থেকে নৃশংস অত্যাচারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়ায় পাঠানো হতো। এতো সবের পর একটি বিশাল ইসলামিক চেতনার স্রোত বইছে সিরিয়ার রণাঙ্গনে। চলছে সেটা ইয়েমেন এবং উত্তর আফ্রিকা ও বিশ্বজুড়ে। ইসলামের শাশ্বত চেতনার সামনে স্বৈরশাসন কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারবে না। বিজয় ইসলামেরই হবে । সেদিন আর বেশি দূরে নয়। তাই সিরিয়ায় জনগণ আসাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে লিপ্ত তার বিজয় অনিবার্য তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বরং সম্ভাবনা বিশাল। সেটি মধ্যপ্রাচ্যের শুধু নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস পাল্টাতে। শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না।

ফরজ সালাতের পরের দোয়া

১. এক বার (আল্লাহু আকবার) বলা। ‘আল্লাহ সর্বপেক্ষা মহান।’ (বুখারী ৮৪২, মুসলিম ১৩৪৪)

২. তিন বার (আসতাগফিরুল্লাহ) বলা। ‘আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করছি।’ (মুসলিম ১৩৬২, নাসাঈ ১৩৩৬)

৩. তারপর এই দোয়া পড়া :

আল্লা-হুম্মা আনতাস্ সালা-ম ওয়া মিন্‌কাস সালা-ম, তাবা-রাক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌রা-ম। অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক!’ (মুসলিম ১৩৬২, নাসাঈ ১৩৩৬)

৪. তারপর এই দোয়া পাঠ করা–

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা- না’বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি’মাতু ওয়ালাহুল ফাদলু ওয়ালাহুস সানা-উল হাসান। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দিনা ওলাও কারিহাল কাফিরূন।’ **অর্থ:** ‘আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব তারই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। ইবাদত করার যোগ্যতা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি একমাত্র আল্লাহই দান করেন, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি। সমস্ত নিয়ামতের মালিক তিনি, যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনি এবং সকল উত্তম প্রশংসার যোগ্যও তিনি। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করছি। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।’ (মুসলিম ১৩৭১, নাসায়ী ১৩৩৯)

৫. তারপর এই দোয়া পাঠ করা–

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি’আ লিমা আ’ত্বাইতা ওয়ালা- মু’তিয়া লিমা- মানা’তা ওয়ালা- ইয়ানফায়ু যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।’

‘আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব তারই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দেয়ার কেউ নেই। কোনো সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোনো উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত।’ (বুখারী ৬৩৩০)

৬. তারপর এই দোয়া পাঠ করা-

‘আল্লাহুম্মা আ’ইন্নী ‘আলা- যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ‘ইবা-দাতিক।’

‘হে আল্লাহ! আপনাকে স্বরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন।’ (আবু দাউদ ১৫২৪)

৭. এরপর এই দোয়া পাঠ করা-

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আ‘উযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ‘উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা-আর্‌যালিল উমরি। ওয়া আ‘উযুবিকা মিন আযাবিল কবরি।’ **অর্থ:** ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা, কাপুরষতা এবং অধিক বার্ধক্য থেকে। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।’ (তিরমিজি ৩৫৬৭)

৮. তারপর ৩৩ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৪ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার)। (মুসলিম ১৩৮০)

৯. সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাস একবার করে পাঠ করা তবে ফজর ও মাগরীবের পরে তিনবার করে পাঠ করা। (আবু দাউদ ১৫২৫)

১০. আয়তুল কুরসী একবার পাঠ করা।

একজন ছোট্ট মুজাহিদ, আব্দুল হামীদ হামজার চিঠি

আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা...
দয়া করে আর কেঁদো না... আমরা একদিন সাক্ষাৎ করবো... একসাথে ইসলামের পথে।
বাবা... বলো আমরা জিহাদ করি শান্তির জন্য; শুভ বিদায় বাবা... আল্লাহ যেনো সবসময় তোমার সাথে থাকেন।
ও আল্লাহ! তুমি কত না করুণাময়, তুমি আমাদের অনেক কিছু রহমত স্বরূপ দিয়েছো, অথচ আমরা তোমাকে সেগুলোর জন্য ধন্যবাদ জানাই না, তা সত্ত্বেও, তুমি প্রতিদিন আমাদের বিভিন্নভাবে তোমার নিয়ামত দান করে যাচ্ছো।

ও আল্লাহ! তুমি কত না সুন্দর, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছ এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য যেমন কাজ আমাদের করা উচিত যা সম্পর্কে অবগত করেছ, যাহোক, আমরা এতটাই ঔদ্ধত যে আমরা ঐসব কাজগুলোকে অবজ্ঞা করি যা আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

ও আল্লাহ! আমার বাবা সবকিছু ছেড়ে তার জীবন উৎসর্গ করেছেন তোমার দ্বীনকে সমুন্নত করতে। তিনি এ দুনিয়াতে কোনো কিছুকেই প্রাধান্য দেননি; না টাকা পয়সা, না সম্পত্তি; প্রকৃতপক্ষে তিনি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র স্মরণ রেখেছিলেন যে এ দুনিয়ায় ইসলামকে উঁচু ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ও আল্লাহ! এ কারণেই তিনি আমাদের মুহাম্মদ কাসিম, মাহমুদ গজনবী, তারিক বিন যায়েদ এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এর গল্প বলতো, অবশেষে, তিনিও, তাদের মতো, শত্রুদের বিপক্ষে অস্ত্র-ধরলো এবং তার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু বের হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকলো। ও আল্লাহ! বাবার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও এবং তাঁকে বলে দিও তার ছোট্ট ছেলেটি খুব ভালো আছে। ও আল্লাহ! দয়া করে তাকে এটাও বলো যে, তার ছোট্ট ছেলেটি এই রমজানে জীবনের প্রথম রোজা রাখবে।

ও আল্লাহ! আমাদের অনুপস্থিতিতে বাবাকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করো; এ দুনিয়ার জীবন অনেক ছোট। মা বলে এ দুনিয়ার জীবন হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যাবে, আর তখন কোনও মা, বাবা, ভাই, বোন, ছেলে অথবা মেয়ে কেউই কাজে আসবে না। ঐ দিন একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন সদস্যের জন্য সুপারিশ করতে পারবে এবং তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

ও আল্লাহ! বাবাকে বলে দিও যে মা যখনই তার কথা বলে, অনেক কষ্ট পায়। কিন্তু সে আমাকে অনেক সাহস দেয়। সে নিঃশব্দে কাঁদে, কিন্তু সে কখনো অধৈর্য ও অসংযমী হয়ে কাঁদেনি। ও আল্লাহ! বাবাকে বলো হতাশ না হতে। আমার মা অনেক সাহসী মহিলা, সে কাপড় সেলাই করে এবং প্রতিবেশীদের বাসন ধুয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সে আমাকে দিনে স্কুলে এবং রাতে কাজ শেষ করে আমাকে সাহসী ও বীরদের গল্প বলে, যেমনটি আমার বাবা করতো, এবং বলে, আমি যেনো আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেই।

ও আল্লাহ! ঈদ প্রায় চলে আসছে। অন্য ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবার সাথে নতুন জুতা কিনবে। তাদের দর্জি দিয়ে বানানো নতুন কাপড় আছে এবং ঈদ উপহারও কিনেছে বন্ধুদের সাথে দেয়া-নেয়া করতে। যখনই মাকে নতুন জুতা ও কাপড় কিনে দিতে বলি মা উত্তর দেয় না। সে শুধু নিশ্চুপ থাকে আর অন্য ঘরে চলে যায়। এখন আর আমি তার কাছে আবদার করি না। হয়তো বা এর পিছনে কোনো ভালো কারণ আছে।

কিন্তু আল্লাহ! বাবাকে বলে দিও উদ্বিগ্ন না হতে। যদিও আমি নতুন কাপড় না পাই, যদিও আমি নতুন জুতা না পাই- তাতে কি? ঈদ তো একটি দিনই, এটা কেটে যাবে। দিনটা কাটানোর পরিবর্তে খেললাম, যা ছেলে-মেয়েরা করে এবং বাজারে না গিয়ে সময়টা আমি মার সাথে কাটাবো। যাহোক, আমি আর বাচ্চা নেই। আমি বুঝতে শিখেছি। আমার সাহস ও সংকল্প অনেক মজবুত।

ও আল্লাহ! বাবাকে বলে দিও আমরা অনেক খুশি। আমার কিছুর অভাব নেই। শুধু বাবাকে বলো আমাদের মনে করতে। এবং আল্লাহ, বাবাকে বলো দুশ্চিন্তা না করতে, যেহেতু আমি আর কাঁদি না।

কেউ নেই যে আমাদের আদর করে কিছু বলবে, কেউ নেই যে আমার সাথে কোনো খেলা খেলবে, কেউ নেই যে আমার সাথে রাগ করবে, কিন্তু মা সবসময় চেষ্টা করে আমাকে খুশি রাখতে।

যখন আমি শুনি অত্যাচারীরা আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, গুজরাট, আমরণ (ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ) এবং চেচনিয়ার ছেলে-মেয়েদের ঘর ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তাদের বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে, আমি নিজের দুঃখ ভুলে যাই। আমি খবরের কাগজে তাদের ছবি দেখি; তারা হতাশ হয়ে বসে আছে; কেউ বসে আছে তাদের ভাঙা ঘরের স্তূপের উপরে; কেউ বা অসহায়ের মতো তাদের পরিবার পরিজনের মৃত দেহের পাশে। আর এজন্যই আল্লাহ! তুমি আমার বাবাকে বলে দিও চিন্তা না করতে, কারণ আমি (তার অবর্তমানে) দুঃখ পাই না।

সংগ্রহে: আবু হানীফ ও মুহাম্মদ নাঈম খান

শাহাদাতের পেয়ালা

সায়ীদ উসমান

মায়ের দু'আ

ঘরের কোণে দু'আয় মগ্ন এক নারী। অতিবৃদ্ধা। দৃষ্টির আলো তার প্রখরতা হারিয়ে নিভু নিভু করতে করতে হারিয়েই গেছে। আর তার দাঁত জীবন প্রভাতে যেমনটি ছিলো, আজ তার জীবন সন্ধ্যায় তেমনই আছে। জান্নাতি লাবণ্য ধারণ করেছেন তিনি চেহারায়। জীবনপ্রদীপ জ্বলছে তার একশ বছর ধরে। ইতিহাসের সোনালি পাতায় রূপালি হরফে তার নাম লেখা আছে 'আসমা' বলে।
আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), প্রিয় পুত্রের জন্য দু'আয় মগ্ন তিনি। ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুল্লাহকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলো সবাই। হেজাজ, মিশর, ইরাক, খুরাসান ও সিরিয়ার প্রায় সব এলাকাই বাইয়াত করেছিলো তার হাতে। কিন্তু হঠাৎ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে বসলো বনু উমাইয়া। সম্মানিত এক সাহাবির বিরুদ্ধে তরবারি খাপমুক্ত করলো রক্ত পিপাসু জালেমরা। দুই দলের মাঝে শুরু হলো যুদ্ধ। ভাই ভাইয়ের রক্তে রাঙালো তরবারি। বীর সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) রুখে দাঁড়ালেন। দুঃসাহসি যোদ্ধার মতো দুর্দান্ত আক্রমণে কাঁপিয়ে দিলেন শত্রুশিবির। কিন্তু তার সহযোদ্ধারা অজানা কারণে ছেড়ে যেতে লাগলো তাকে। অল্পকজন শুধু রয়ে গেলো তার সাথে। নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয়ে গেলো। পরাজয়ের পূর্বাভাস দেখা দিলো ধীরে ধীরে। তাই অবশিষ্ট যোদ্ধাদের নিয়ে কাবা শরীফে আশ্রয় নিলেন তিনি।
পুত্রের এমন দুর্দিনে মমতাময়ী মা কি বসে থাকতে পারেন? আল্লাহর নিকট পুত্রের কল্যাণ কামনায় মগ্ন তিনি। হাত তুলে দু'আ করছেন ঘরের কোণে বসে।

পদশব্দ:

এ সময় কারো পদশব্দ দু'আর মগ্নতা ভেঙে দিলো তার। এ পদশব্দ তার বড় চেনা। তিনি সচকিত হলেন। পদশব্দের উৎসের দিকে ঘুরলেন, চেহারায় শুভ্ররোদের উজ্জ্বলতা মেখে, 'আস সালামু আলাইকুম ইয়া উম্মি'। পুত্রের সালাম শুনে হঠাৎ যেনো দিশেহারা বোধ করলেন তিনি। চেহারার উজ্জ্বলতা গেলো হারিয়ে। যেনো একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিলো তার মুখাবয়ব। গমগম করে উঠলো তার কণ্ঠ–
'ওয়ালাইকাস সালাম ইয়া আব্দাল্লাহ, ব্যাটা আমার! হাজ্জাজের কামান মক্কার আমান যখন দিচ্ছে ধ্বংস করে, মসজিদে হারামের ইজ্জত যখন হুমকির মুখে,

কোন দুখে তখন ঘরে এলে তুমি?'
'তোমার সাথে মাশওয়ারা করতে এসেছি মা।'

'মাশওয়ারা! আমার সাথে!'
নির্জলা বিস্ময়ের পাত্র উপুড় করে দিয়ে বললেন মা।
'তা, কি বিষয়ে মাশওয়ারা ব্যাটা?'
'মা, যোদ্ধারা আমায় হতাশ করেছে। ওরা ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে হাজ্জাজের ভয়ে। কেউ কেউতো পক্ষ ত্যাগ করেছে লোভের বশে। এমনকি মা! আমার স্বগোত্রীয়রাও ছেড়ে গেছে আমাকে।
এখন ক্ষুদ্র একটি যুদ্ধদলই আমার সঙ্গি।
প্রিয় মা আমার!
হাজ্জাজের দূতেরা বলাবলি করছে– অস্ত্র ছেড়ে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আনুগত্য মেনে নিলে যা চাইব তাই দেবে ওরা।
কল্যাণকামি মা আমার!
বলে দাও কি করবো আমি!'

আসমা বিনতে আবু বরক (রা.) চুপ মেরে রইলেন। তার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। আগুনবর্ণ ধারণ করলো চোখ দুটো। হাত মুষ্টিবদ্ধ। একপৃথিবী ঝড়ো হাওয়া ভর করলো তার কণ্ঠে।
ক্রুদ্ধতার ঝড়োমেঘ ঝরিয়ে বলে উঠলেন–
'ব্যাটা! সিদ্ধান্ততো তুমিই নেবে। যদি আস্থাবান হও যে, তুমি আছো হকের ওপর, আর লড়ে যাচ্ছো হক প্রতিষ্ঠার জন্য, তবে তুমি লড়ে যাও। আর তুমি যদি হও দুনিয়া প্রত্যাশি, তবে তো ধ্বংস করেছো নিজের জীবন, আর সঙ্গীদের ও করেছো ধ্বংস।'
'কিন্তু প্রিয় মা আমার!
আমি তো আজই শহীদ হয়ে যেতে পারি।'
'সেটাই কি তোমার কাম্য নয়?'
'মা! সেটাই একমাত্র কাম্য আমার! কিন্তু ওরা আমার মৃতদেহ বিকৃত করে ফেলবে।'
'শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট যখন ছোঁয়াবে তুমি, আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে যখন নিজেকে আবিষ্কার করবে, তখন ভয় পাবার কি আছে তোমার?

'শোনো, যবাইকৃত মেষশাবক চামড়া ছড়ানোর কষ্ট অনুভব করে না।'
গর্ভধারিণী মায়ের মুখে কঠিনবাস্তব কথাগুলো শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা.) মনে জান্নাতের পায়রা উড়তে লাগলো। যেনো আঁধার ফুড়ে উড়ে এলো ভোরের আলো। সেই আলোয় কর্তব্য স্থির করে ফেললেন তিনি।
'ওগো মা আমার! ময়দান ছেড়ে ঘরে কেনো এসেছি জানতে চেয়েছিলে তুমি! শোনো মা!
আমি তো এই কথাগুলোই শুনতে এসেছিলাম।
শোনো! দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঝাপসা কুয়াশা আমার মনে বাসা বাঁধতে পারে নি। ভীরুতার কালো পর্দা দেয়াল সৃষ্টি করতে পারেনি মনের ভেতর। মা! দুনিয়ার মোহ বিদ্রাহভরে প্রত্যাখ্যান

করেছি। ক্ষমতার লালসায়ও আমি আক্রান্ত হইনি।
বিশ্বাস রাখো মা!
তোমার গর্ভজাতপুত্র শুধু লড়াই করছে হক্বের জন্য।
তুমি আস্থা রাখো তোমার পুত্রের ওপর!
জীবনে কখনো সে অন্যায় করেনি।
অশ্লীলতা তার কাছে ঠাঁই পায়নি।
প্রভুর হুকুমের খেলাফ করেনি কখনো, মুসলিম-অমুসলিম জুলুম করেনি কারোর প্রতি।
আল্লাহর সন্তুষ্টি তার কাম্য।
শাহাদাতের মৃত্যু তার সব থেকে আরাধ্য বিষয়।
মা!
এসব বলছি শুধু এই জন্য যে, যেনো তুমি ধৈর্য ধরতে পারো।'

প্রিয় পুত্রের কথা শুনে মা হাসলেন। প্রশান্তির ঢেউ ছড়ানো চাঁদরাঙা হাসিতে ঝলমল করে উঠলো তার চেহারা।
'আলহামদুল্লিাহ, ব্যাটা আমার! আল্লাহর পছন্দের পথই পছন্দ করেছো তুমি।

ব্যাটা! লোহার মতো শক্ত কি পড়েছ এটা?'
'লৌহবর্ম পড়েছি মা! সব যোদ্ধারাই পড়ে।'
'যে শহীদ হতে চায়, এটা তার পোশাক হতে পারে না ব্যাটা।'
'মা! এটাতো আমি তোমাকে খুশি করার জন্য পড়েছি।'
'ব্যাটা বর্ম খুলে ফেললেই খুশি হবো আমি।
তবে হ্যাঁ, কয়েকটি পাজামা পড়ে নিও। মাটিতে পড়ে গেলেও তোমার ছতর যেনো উন্মুক্ত না হয়।'

সিদ্ধান্ততো তুমিই নেবে।
যদি আস্থাবান হও যে, তুমি আছো হকের ওপর, আর লড়ে যাচ্ছো হক প্রতিষ্ঠার জন্য, তবে তুমি লড়ে যাও। আর তুমি যদি হও দুনিয়া প্রত্যাশি, তবে তো ধ্বংস করেছো নিজের জীবন, আর সঙ্গীদের ও করেছো ধ্বংস।'
'কিন্তু প্রিয় মা আমার!
আমি তো আজই শহীদ হয়ে যেতে পারি।'
'সেটাই কি তোমার কাম্য নয়?'
'মা! সেটাই একমাত্র কাম্য আমার! কিন্তু ওরা আমার মৃতদেহ বিকৃত করে ফেলবে।'
'শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট যখন ছোঁয়াবে তুমি, আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে যখন নিজেকে আবিষ্কার করবে, তখন ভয় পাবার কি আছে তোমার?
'শোনো, যবাইকৃত মেষশাবক চামড়া ছড়ানোর কষ্ট অনুভব করে না।'

শাহাদাৎ

সময় ঘনিয়ে এলো।
এবার বিদায় নেয়ার পালা। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বর্ম খুলে ফেললেন। পাজামা পরে নিলেন কয়েকটি। মসজিদে হারামের দিকে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। তার আগে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ালেন মায়ের সামনে। বিচ্ছেদ বেদনাভরা গভীর চোখে তাকালেন মায়ের দিকে।
'প্রিয় মা আমার! তোমার দু'আর হাত উঠিয়ে রাখো আমার জন্য।
বিদায় মা!
আবার দেখা হবে জান্নাতে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বেরিয়ে গেলেন বীরের মতো। আর মা তার হাত উঠিয়ে ধরলেন আল্লাহর দরবারে।
'ইয়া আল্লাহ! তার নামাজে রহম করো। রহম করো তাহাজ্জুদে তার বুকফাটা কান্নার প্রতি।
হে আল্লাহ মহান!
আমার ব্যাটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছি তোমার জন্য। আল্লাহ! সব ব্যাপারেই তোমার ফায়সালা কল্যাণকর। আমার আব্দুল্লাহর জন্য তুমি যা ফায়সালা করবে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।
হে আল্লাহ! তার ব্যাপারে আমাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দাও।
এক সাহাবিয়া মায়ের কান্না আল্লাহর আরশে পৌছে গিয়েছিলো মুহূর্তেই। তার অশ্রুর ফোঁটা নাকের বোঁটায় পৌছার পূর্বেই প্রভুর দরবারে হয়ে গিয়েছিলো মকবুল। তাইতো সেদিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই তার প্রিয় পুত্রের জন্য ফেরেশতারা শাহাদাতের পেয়ালা নিয়ে হাজির হয়েছিলো। পান করিয়েছিলো তাকে পরম শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখিয়ে।
পুত্রের শাহাদাতের সংবাদ জানানো হলো মা আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) কে। হৃদয়ের গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এলো শুকরিয়ার শব্দগুচ্ছ। বললেন-
'আলহামদুলিল্লাহ, আমি এজন্যই তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। আর কিয়ামতে বলতে পারবো-
'এই দেখো আল্লাহ! কে এসেছে তোমার কাছে! এক শহীদের মা এসেছে। তমি তার ওপর সন্তুষ্ট তো?'

আন্তর্জাতিক

সিরিয়া সংঘাত : কেড়ে নিয়েছে সাড়ে তিন হাজার শিশুর প্রাণ

সিরিয়ায় ২২ মাস ধরে চলা সংঘাতে মারা গেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নিষ্পাপ শিশু। সোমবার মারা গেছে ১৩ জন। আগের দিনও মারা গেছে ১৪ শিশু। বড়দের ক্ষমতার লড়াইয়ে অক্ষম, অবোধ শিশুর মৃত্যু যেন নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সিরিয়ায়। যুদ্ধে সব বয়সের মানুষ মারা যাবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আক্রমণের শিকার যদি যুদ্ধরত সশস্ত্র প্রতিপক্ষ হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহলে নারী ও শিশু মারা যাওয়ার কথা নয়। তবে সিরিয়ায় দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। ব্রিটেনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস' জানিয়েছে, সোমবার দামেস্কে বাশার আল আসাদের অনুগত বাহিনীর হামলায় হতাহতদের মধ্যে ১৩ জনই শিশু। সংস্থাটির প্রধান রামি আবদেল রহমান বলেন, 'নিহত শিশুদের বয়স ছয় থেকে নয় বছর। রোববারের চিত্র আরও ভয়াবহ। দামেস্কের কাছে বিদ্রোহী অধিকৃত এক এলাকায় ব্যাপক বোমা হামলা চালায় আসাদের অনুগত বাহিনী। সে হামলায় মারা যায় ৩৬ জন। ৩৬ জনের ১৪ জনই শিশু।' আসাদ সরকার যুদ্ধ শুরুর পরই যুদ্ধক্ষেত্রে বিদেশি সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। ফলে সংবাদ মাধ্যম সব খবরের ব্যাপারেই সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের ওপর নির্ভরশীল। সংস্থাটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৪৬ হাজারের মতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন আগে জাতিসংঘ জানায়, তাদের আশঙ্কা নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০ হাজার হবে। এদিকে সোমবার বাশার আল আসাদের অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তুলেছে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। মানবাধিকার সংস্থা দুটির মতে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপক হারে।

এ বিষয়ে আসাদ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য আসেনি।
সোমবার সরকারপন্থী বলে পরিচিত আল থাওয়ারা পত্রিকা তীব্র সমালোচনা করেছে জাতিসংঘ ও আরব লিগের সিরিয়াবিষয়ক দূত লাখদার ব্রাহিমির। পত্রিকাটি লিখেছে, 'ব্রাহিমি এক বুড়ো পরিব্রাজকের মতো, যিনি ঘুরে ঘুরে প্রায় সারা পৃথিবী দেখে ফেলেছেন, কিন্তু সিরিয়া সঙ্কট নিরসনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করা ছাড়া আর কিছুর চেষ্টাই করেননি।'

উৎস : আমার দেশ-১৬/০১/১৩

যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও বেশি মার্কিন সেনা মারা যাচ্ছে আত্মহত্যায়

গত বছর আফগানিস্তানে যুদ্ধক্ষেত্রে যত মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে তার চেয়ে বেশি সেনা আত্মহত্যা করেছে। মার্কিন সামরিক সংবাদপত্র স্টারস অ্যান্ড স্ট্রিপসে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস জানিয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন সেনাবাহিনীতে আত্মহত্যার মাত্রা গত বছর আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর দেশটিতে ৩৪৯ সেনা আত্মহত্যা করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিষয়ক মুখপাত্র সিনথিয়া স্মিথ এ খবরটি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ২০১২ সালে আফগান যুদ্ধে যত মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে তার চেয়ে বেশি সেনা আত্মহত্যা করেছে। গত বছরের মে মাসে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেট্টা বলেছিলেন, পেন্টাগন যেসব জটিল ও জরুরি সঙ্কট মোকাবিলা করছে তার অন্যতম হলো সেনাদের আত্মহত্যা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মার্কিন সেনাবাহিনীতে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। গত বছরের আগস্টে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধের আশঙ্কায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণে মার্কিন সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা আগের চেয়ে বেড়েছে।

পেন্টাগনের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো এর আগে জানিয়েছে, সেনাবাহিনীতে আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকানোর জন্য মানসিক চিকিৎসার সাইকোগ্রাফি ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও গত বছর অপ্রত্যাশিতভাবে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।
এপি

চিত্র :আমেরিকান সন্ত্রাসীদের লাশের কফিন

বিশ্বে গুপ্তহত্যা অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওবামা : চমস্কি!

সারা বিশ্বে যে গুপ্তহত্যা অভিযান চলছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আমেরিকার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক নোয়াম চমস্কি একথা বলেছেন।

ভয়েস অব রাশিয়াকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে চমস্কি আরও বলেন, ওবামা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। প্রেসিডেন্ট ওবামার নেতৃত্বেই বিশ্বে গুপ্তহত্যা পরিচালিত হচ্ছে বলেও তিনি জোরালো মন্তব্য করেন। চমস্কি বলেন, যদি রাশিয়া এ ধরনের আচরণ করত তাহলে লোকজন পরমাণু যুদ্ধের কথা বলাবলি শুরু করত। তিনি অভিযোগ করেন, আমেরিকা জোরালোভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে সমর্থন করছে, এমনকি কোথাও কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। নোয়াম চমস্কি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সৌদি আরবের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে মারাত্মক রেকর্ড থাকার পরও দেশটির কাছে অস্ত্র বিক্রি করেই চলেছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের আমলে ওয়াশিংটন যেসব যুদ্ধ শুরু করেছিল তার অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওবামা আমেরিকার ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি গত চার বছরের মেয়াদে সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ড্রোন হামলার মতো জঘন্য অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।
এসব হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ মারা গেছে; আহত হয়েছে আরও কয়েক গুণ বেশি। এছাড়া, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের কথা থাকলেও এখন সেখানে দীর্ঘমেয়াদে সেনা মোতায়েন রাখার পরিকল্পনা করছেন ওবামা।
সূত্র : রয়টার্স

থাই পত্রিকার মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন : একবিংশ শতাব্দীতেও দাসপ্রথার শিকার রোহিঙ্গা মুসলিমরা

দাসপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলেও আক্ষরিক অর্থেই থাইল্যান্ডে চলছে এ নির্মম দাস ব্যবসা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ ও আধুনিক এই দেশে দাস প্রথার শিকার মিয়ানমারের হতভাগ্য রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। থাইল্যান্ডের 'ফুকেতওয়ান' পত্রিকায় গত ১৬ জানুয়ারি 'দ্য হিডেন অ্যাগোনি অব এ টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি স্লেভ ট্রেড' শিরোনামে একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন ছাপা হয়। সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হলো :
ইসমাইলকে থাইল্যান্ডে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। দেশটিতে দাসপ্রথা বেআইনি হলেও শত শত রোহিঙ্গা মুসলিমকে এখানে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। তার শরীর পৈশাচিক বর্বরতার ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে।
ইসমাইল জানান, তাকে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল। মুখ নিচু করে শুইয়ে নির্দয়ভাবে পেটানো হয় তাকে। অন্তরীণ দাসরা সব সময়ই যা করে থাকে, তিনিও তাই করতে চেয়েছিলেন, পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।
এটা ২০১৩ সালের থাইল্যান্ড। তার বিধ্বস্ত শরীর সাক্ষী দিচ্ছে যে, দুর্নীতি আর দাসপ্রথা থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি থাইল্যান্ড।
ফুকেটের একটি সংগঠন ৪০ হাজার বাথ দিয়ে কিনে দাসত্ব থেকে চলতি মাসে ইসমাইলকে মুক্তি দেয়। সংগঠনের এসব ভালো মানুষ থাইল্যান্ডের একজন দাসকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। কিন্তু দেশটিতে তার মতো আরও শত শত, সম্ভবত হাজার হাজার দাস নিগৃহীত হচ্ছে।
সম্প্রতি থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া সীমান্তে অভিযান চালিয়ে থাই কর্তৃপক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশুদের উদ্ধার করে, যাদের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল। এ ঘটনায় থাইল্যান্ডের থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে।
দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে দাস ব্যবসা চালাচ্ছে থাইল্যান্ডের রাজনীতিকরা। যদিও সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে শত শত রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে ইসমাইল বলছেন, এখনও অনেক দাসকেন্দ্র অক্ষত রয়ে গেছে।
মিয়ানমারের সিত্তে অঞ্চলে রোহিঙ্গাবিরোধী ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে গত ১৪ নভেম্বর স্ত্রী ও সাত সন্তানকে রেখে পালিয়ে আসেন ৪৭ বছর বয়সী ইসমাইল। তার মতোই মিয়ানমারের ৮ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম এখন দেশহীন মানবে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ এদের বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছে।
নিজের ভাগ্য বদলের জন্য অজানা গন্তব্যে পাড়ি দিতে ইসমাইল আদম ব্যাপারীদের দুই লাখ কিয়াত দিয়েছিলেন। একটি খোলা নৌকায় যখন তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন তার সঙ্গে ছিল চার নারী, ছয় শিশুসহ ৬১ যাত্রী।
আদম ব্যাপারীরা তাদের মিয়ানমার-থাইল্যান্ড সীমান্তের রানোং উপকূলে ফেলে আসে। এরপর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় থাইল্যান্ডের নারথিওয়াত প্রদেশের একটি বন্দিশালায়।
মুক্তিপণের জন্য এখানে ইসমাইলের ওপর বর্বরতা শুরু হয়। টানা চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ইসমাইল বুঝতে পারেন থাইল্যান্ডে আধুনিক দাসপ্রথার নির্মম বাস্তবতা।
মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পাওয়ার জন্য ইসমাইল মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত তার শ্যালিকাকে বারবার ফোন করেন। রিং বাজলেও বিপরীত দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় প্রতিদিনই তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে।
ইসমাইল ও তার মতো শত শত দাসকে দিনে দু'বেলা শুধু দু'চামচ ভাত

দেয়া হতো সকালে ও রাতে। অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি পালিয়ে পাশের একটি জঙ্গলে আশ্রয় নেন। তবে তিনি বেশিদূর যেতে পারেননি। এরপর সশস্ত্র রক্ষীরা তাকে ধরে নিয়ে আসে। হাতকড়া পরিয়ে তাকে বেত দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। জ্বলন্ত মোমবাতি ও লোহার রড দিয়ে তার পিঠে ছ্যাঁকা দেয়া হয়।
মুক্তি পেয়ে তিনি যখন উপস্থিত লোকদের তার ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন দেখান, তখন অনেকের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। অনেকে অবাক হন এই ভেবে যে, ২০১৩ সালেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে!
ইসমাইল জানান, অনেক বন্দীকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
দেশহীন রোহিঙ্গা মুসলিমদের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই। মিয়ানমার সরকারের জাতিগত শুদ্ধি অভিযানে রোহিঙ্গারা একঘরে হয়ে পড়েছে।
নয়জনের সংসারে ইসমাইলের দরকার দৈনিক দুই কেজি চাল। কিন্তু তিনি তা-ও জোটাতে পারতেন না। সারাদিন তিনি যে মাছ ধরতেন, তা টহলরত সেনারা ছিনিয়ে নিত। এ অবস্থায় দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্ত্রী, ৫ ছেলে ও ২ মেয়েকে রেখে অজানা গন্তব্যে পাড়ি দিয়েছিলেন ইসমাইল।
সূত্র: আমার দেশ–২০/০১/১৩

আফগান তাগূতগোষ্ঠীর নিরাপত্তারক্ষীরা কারজাইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করে দলে দলে তালেবানে যোগ দিচ্ছে

গত চার মাসে আফগানিস্তানের ৫০ জন সরকারি সৈন্য তালেবানে যোগ দিয়েছে বলে দেশটির সরকার জানিয়েছে। আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ খবর নিশ্চিত করে বলেছে, আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা সেদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর এ ঘটনা কোনো প্রভাব ফেলবে না।
আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের তালেবানে যোগ দেয়ার সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত সপ্তাহে নিমরুজ প্রদেশে। ওই প্রদেশের **চার পুলিশ একটি পুলিশ ভ্যান ও বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তালেবানে যোগ দিয়েছে** বলে ইরানের বার্তা সংস্থা ফার্স জানিয়েছে।
সূত্র : ইসলাম ফর ইউনিভার্স

চলতি বছর ৩৪ হাজার সেনা ফিরিয়ে নেবে যুক্তরাষ্ট্র : মার্কিন সেনা রাখার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত কর্মকর্তারা

চলতি বছর আফগানিস্তান থেকে ৩৪ হাজার সেনা ফিরিয়ে নেবে মার্কিন সরকার। স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ ঘোষণা দেবেন বলে নিশ্চিত করেছেন ওবামার দুই সহযোগী। বর্তমানে আফগানিস্তানে যে পরিমাণ সেনা অবস্থান করছে, তার অর্ধেক আগামী এক বছরের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে নেয়া হবে। বাকি সেনাদের ২০১৪ সালের মধ্যে ফেরত নিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন।
তবে ২০১৪ সালের পর আফগানিস্তানে আরও কিছু সেনা রেখে দেয়ার পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রশাসন। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি তারা।
গত মাসে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটনে বৈঠকের সময় বারাক ওবামা সেনা সরানোর বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি চূড়ান্ত পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে। কবে এ অধিবেশন বসবে তা এখনও জানা যায়নি। এদিকে হোয়াইট হাউস আফগানিস্তান থেকে সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করলেও সেদেশে তাদের সেনা উপস্থিতি বজায় রাখার পরিকল্পনা করায় আফগানিস্তানের ব্যাপারে মার্কিন নীতি নিয়ে সন্দেহ আরও জোরদার হয়েছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, মার্কিন সেনারা চলতি সপ্তাহের প্রথম থেকে আফগানিস্তান থেকে তাদের সামরিক সরঞ্জামের একটা অংশ সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করেছে।
মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা লিন ক্যারল বলেছেন, ২৫টি কনটেইনারে করে এসব সামরিক সরঞ্জাম পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও বলেছেন, এসব সামরিক সরঞ্জামের প্রথম চালান আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ন্যাটো ও মার্কিন বাহিনী ১১ বছর পর তাদের যুদ্ধ সামগ্রীর একটি বড় অংশ আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নেবে। মার্কিন এই সেনা কর্মকর্তা লিন ক্যারল আরও বলেছেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে এক লাখেরও বেশি বিদেশি সেনা ও ২০০টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় তিন মাস আগে এক বিবৃতিতে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে তাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছিলো।
ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছিলো, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সব সেনা ২০১৩ সালে আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য পাকিস্ত-ানের ভূমি ব্যবহার করতে পারবে।
এদিকে ন্যাটো ও মার্কিন সেনারা পর্যায়ক্রমে আফগানিস্তান থেকে সেনাবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম প্রত্যাহারের কাজ শুরু করলেও অন্য এক খবরে জানা গেছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন এখনও আফগানিস্তানে বেশকিছু মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে আফগানিস্তানে ন্যাটোর কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরও পেন্টাগন তাদের প্রায় আট হাজার সেনা আফগানিস্তানে রেখে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে।

মার্কিন সেনা কর্মকর্তারা বলছেন, আফগানিস্তানে মোতায়েন বিদেশি সেনাসংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সেদেশে গত ১১ বছরে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সামরিক সাফল্য বা অর্জনগুলো ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিপুল অর্থব্যয় তাদের উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরবিরোধী নীতি-অবস্থানের কারণে মার্কিন সেনা কর্মকর্তারা ও হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মকর্তারা আফগানিস্তানে সেনা মোতায়েন রাখা না রাখার বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি।

আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার পরিকল্পনার ব্যাপারে গত মাসে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপ-প্রধান বেন রুদায়ের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, আফগানিস্তানের ব্যাপারে হোয়াইট হাউস চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। এর আগে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছিলেন, ২০১৪ সালের পরও তাদের তিন থেকে নয় হাজার সেনা আফগানিস্তানে মোতায়েন থাকবে। আফগানিস্তানে বিদেশি সেনাবাহিনীর সাবেক কমান্ডার জেনারেল জন ওলান ২০১৪ সালের পরও আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন। কী পরিমাণ সেনাসংখ্যা মোতায়েন রাখা হবে তা নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন।

উৎস : আমার দেশ-১৪/০২/১৩ ইং

মালির সেনাবাহিনীর 'নৃশংসতায়' উদ্বিগ্ন জাতিসংঘের দূত

জাতিসংঘের গণহত্যাবিরোধী দূত আদামা দিয়েং বলেছেন, মালির উত্তরাঞ্চলের দখল নেওয়ার লড়াইয়ে দেশটির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে নৃশংসতার অভিযোগ উঠেছে, তাতে তিনি 'গভীর উদ্বিগ্ন'। এই নৃশংসতা 'জঘন্য অপরাধের' শামিল। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

ফ্রান্সের সহায়তা নিয়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে মালি। এরই মধ্যে জঙ্গিদের কাছ থেকে দেশটির উত্তরাঞ্চলের দখল নিতে সক্ষম হয়েছে মালির সরকার।

এদিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ গতকাল মালি সফরে যান। সেখানে সরকারের শীর্ষ নেতারা তাঁকে স্বাগত জানান।

ওলাঁদ উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মালির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডিওনকান্ডা ট্রাওরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এর আগে ওলাঁদ মালির সেনাবাহিনীকে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়ার কথা ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘের দূত আদামা দিয়েং বলেন, মালির যেসব এলাকায় লড়াই হয়েছে, সেসব এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা ও গুমের অভিযোগ উঠেছে মালির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। এসব এলাকায় জাতিগত **আরব ও তুয়ারেগ সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক নৃশংসতা ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।**

আদামা দিয়েং বলেন, 'মালির সেনাবাহিনী জঙ্গিদের কাছ থেকে উত্তরাঞ্চলের দখল নিলে ওই এলাকার জনমনে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আরব ও তুয়ারেগদের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা চালানোর অভিযোগ উঠেছে, তাতে আমি গভীর উদ্বিগ্ন।'

দিয়েং বলেন, 'জাতি বা বর্ণ বিবেচনা না করে প্রতিটি জনগণকে রক্ষা করা মালির সেনাবাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।' মালির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগ তদন্তে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) তদন্তের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আইসিসির প্রধান কৌঁসুলি ফাতুউ বেনসৌডা চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে জানান, মালির সেনাবাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে তদন্ত করবে আইসিসি। ফাতুউ বেনসৌডা বলেন, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিকভাবেই দোষীদের বিচারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিবিসি।

উৎস : প্রথম আলো-০৩/০২/১৩

প্রতিদিন ২২ জন মার্কিন সেনা (সন্ত্রাসী) আত্মহত্যা করছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রবীণ কর্মকর্তাদের (সন্ত্রাসীদের) আত্মহত্যার হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তাদের মধ্যে এখন প্রতিদিন গড়ে ২২জন বা ৬৫ মিনিটে একজন আত্মহত্যা করছে। সরকারি (কুফফারদের) এক সমীক্ষার ফলের বরাত দিয়ে গত শুক্রবার রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব ভেটেরানস অ্যাফেয়ার্স (ভিএ) পরিচালিত এই সমীক্ষার ফল এদিন প্রকাশ করা হয়। ২১টি অঙ্গরাজ্যে সামরিক কর্মকর্তাদের মৃত্যুর সনদ বিশ্লেষণ করে সমীক্ষাটি চালানো হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সমীক্ষায় ১৯৯৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সেনা বাহিনীর প্রবীণ কর্মকর্তাদের (সন্ত্রাসীদের) আত্মহত্যার বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা গেছে, আত্মহননকারী সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬৯ শতাংশের বেশিজনের বয়স ৫০ বছর বা তার ওপর। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই আত্মহত্যার হার প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা (সন্ত্রাসীদের) আত্মহত্যার এই ভয়াবহ চিত্র খুবই দুঃখজনক (আনন্দদায়ক)। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব পালনকালে ৩৪৯ জন শীর্ষ সেনা সন্ত্রাসী আত্মহত্যা করে। এই হিসেবে প্রতিদিন আত্মহত্যার হার গড়ে প্রায় একজন। সম্প্রতি সেনাবাহিনী (সন্ত্রাসীরা) স্বীকার করে, ২০১২ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতে (সন্ত্রাসী) আত্মহত্যার হার ছিল রেকর্ড সংখ্যক।

প্রথম আলো-০২/০২/১৩

সূত্র : রয়টার্স

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগামী না হবে।’ (মেশকাত ১৬৭)
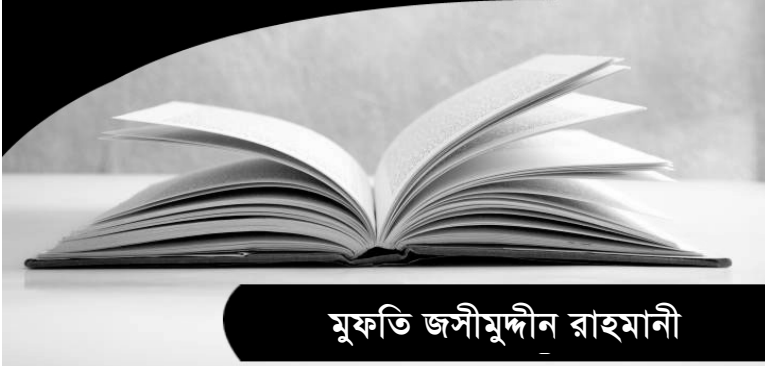
আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.).কে কিভাবে ভালোবাসবো?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সমাজে নানা ভাবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভালবাসার প্রচার করা হয়। কেউ নিজেকে আশেকে রাসুল দাবী করে বিশ্ব আশেকে রাসুল সম্মেলন করার মাধ্যমে। আবার কেউ মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে, কেউ রাসুলের জন্মদিনকে ঈদের দিন বরং সকল ঈদের সেরা ঈদ হিসাবে জ্ঞান করার মাধ্যমে, কেউ রাসুলের জন্মদিনে জশনে-জুলুস-এ-ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী নামক শোভা যাত্রা বের করার মাধ্যমে। আবার কেউ ফাতেহায়ে দোয়াজদাহম পালন করার মাধ্যমে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। কোন সাহাবী নিজেকে আশেকে রাসুল বলে দাবি করেননি। অথচ তারা আল্লাহর রাসূলের ভালবাসায় জীবন পর্যন্ত কোরবান করে দিয়েছেন। তারা কোনো আশেকে রাসুল (সাঃ) সম্মেলন করেন নি, ঈদে মিলাদুন্নবীর বর্ণাঢ্য মিছিলও বের করেননি, রাসুল (সা.) নিজেও কখনো তার জন্মদিনকে ঈদের দিন বলে ঘোষণা করেননি, সাহাবায়েকেরামগণও এই ঈদ উদযাপন করেননি। বরং এগুলো একদল পেট পূঁজারী, ধর্ম ব্যবসায়ী, ভণ্ড বিদ'আতিদের তৈরি করা বিদ'আত। এরা মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসার নামে কৌতুক করছে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) যে দ্বীন নিয়ে পৃথিবীতে আগমণ করেছেন যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেছেন সে দ্বীন আজ ধ্বংস করা হচ্ছে। সে ব্যাপারে এই তথাকথিত আশেকে রাসুলদের কোনো ভূমিকা নেই। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীর, আরাকান, বসনিয়া, চেচনিয়া সহ সর্বত্রই রাসুলের উম্মতের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। পায়খানায় ছুড়ে মারা হচ্ছে। অহরহ রাসুল (সা.)-কে গালিগালাজ করা হচ্ছে। রাসুলের ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কণ করা হচ্ছে। রাসুলের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে ছড়া কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে এই নব্য আশেকে রাসুলদের কোনো ভূমিকা নেই। অথচ হুদায়বিয়ার ঘটনায় একজন মুসলিমের (উসমান) জন্য স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সহ চৌদ্দশ সাহাবায়েকেরাম জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। রাসুলের হাতে হাত দিয়ে বাইআত করলেন। সে বাইআতে আল্লাহ (সুব.)ও খুশি হয়েছেন এবং তাদের হাতের উপরে আল্লাহর নিজের হাত ছিলো বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমানের এই তথাকথিত আশেকে রাসুলগণ এই বাইআতকে ছিনতাই করে পীর-মুরীদির বাইআত চালু করত: ঐ আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন যা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলো আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ছাড়া কিছুই নয়। রাসুল (সা.) কে সত্যিকার ভালবাসতে হলে তার তরিকার অনুসরণ ও তার সুন্নাহের আনুগত্য করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

}

[:]{

‘বলো, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। (সূরা ইমরান, ৩:৩১)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব.) রাসুলুল্লাহ (সা.)এর আনুগত্য করতে বলেছেন। আশেকে রাসুল দাবী করতে বলেন নাই। জশনে-জুলুস-এ-ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী নামক শোভা যাত্রাও বের করতে বলেননি। ‘ঘরে ঘরে মিলাদ দিন রাসুলের শাফাআত নিন’ এভাবে সস্তা শাফাআত পাওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও তার আনুগত্য করতে বলেছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে−

:

":

"

:

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগামী না হবে।' (মেশকাত ১৬৭)
রাসুলুল্লাহ (সা:) আরো ইরশাদ করেছেন–

আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করলো। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! অস্বীকারকারী কে?' রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো না, সে ব্যক্তিই (মূলত) অস্বীকারকারী'। (বুখারী ৭২৮০, মুসনাদে আহমাদ ৮৭২৮)

রাসুল (সা.) যখন জীবিত নেই তখন তার অনুগত্য করা যায় কিভাবে?

এ বিষয়টিও রাসুলুল্লাহ (সা.) পরিষ্কার করে দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

'আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো 'কিতাবুল্লাহ' (আল্লাহর কুরআন)'। (সহীহ মুসলিম ৩০০৯)
অপর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

:

'আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিসকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ গোমরাহ হবে না। সেদুটো জিনিষ হচ্ছে 'আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসুলের সুন্নাহ (সহীহ হাদিস)'। (মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০, মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯)
সুতরাং যদিও আমাদের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবাদের কেউ নেই কিন্তু কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে ঠিকই আছে। আমরা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐ দুটো জিনিস থেকেই ফায়সালা নিব। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

:]{

[

'অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' (সুরা নিসা ৪:৫৯।)
এ আয়াতে আল্লাহর কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আর রাসুল (সা.)-এর কাছে প্রত্যার্পণ কর বলতে সহীহ হাদিসকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, কুরআন ও সুন্নাহর সহিত যার কথা মিলবে তার কথা মানা যাবে। আর কুরআন-সুন্নাহের সাথে যার কথা মিলবে না তার কথা মানা যাবে না সে যতবড় ব্যক্তিই হোক না কেন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে আলেম-বুযুর্গ, মুরুব্বী, পীর-মাশায়েখ, ওলী-আওলীয়াদের পরিমাপ করবো। ওলী-বুযুর্গদের দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে নয়। আমরা যখনই কুরআন-সুন্নাহের দিকে মানুষকে আহ্বান করি তখন মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযুর্গ বা মুরুব্বীদেরকে অনুসরণ করে। আর বলে এত বড় বড় আলেমরা কি কম বুঝেছেন? তারা কি ভুল করেছেন? ইত্যাদি। না! আর এগুলো বলা যাবে না!! কুরআন-সুন্নাহর সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা:) সে কথাই আমাদেরকে অসিয়ত করে গেছেন।
আসুন! আমরা রাসুলুল্লাহ (সা:)-কে সত্যিকারার্থে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করি। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ তথা অহীর বিধান কায়েমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমিন।

-----ooooooooooooooooooo-----

- :
- 'আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিষকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সেদুটো জিনিষ হচ্ছে 'আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূলের সুন্নাহ (সহীহ হাদিস)'। (মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০, মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯)
- [:]{
- 'অত:পর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' (সুরা নিসা ৪:৫৯।)

মুসলিম উম্মাহ'র পতনের কারণ ও প্রতিকার

মুফতি হারুনুর রশীদ
শিক্ষক : মারকাজুল উলূম আল-ইসলামিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অল্প বিস্তর সচেতন মুসলিম মাত্রই জানে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় তারই নেতৃত্বে তৎকালীন সমগ্র আরব মুলুকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ রাষ্ট্রীয় বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর কুফুরি শক্তির সামনে এক অজেয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলো। রাসুলের ওফাতের পরে এ বিজয় ধারা অব্যাহত থাকে। খলিফাতুল মুসলিমীন উমার ফারুক (রা.) এর খিলাফত যুগে তৎকালের দুই বৃহত্তম সম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজিত হয়ে অর্ধ দুনিয়ায় ব্যক্তি হতে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বাত্নক ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর পরে থেমে যায়নি ইসলামের বিজয় ধারা। বরং উম্মাতে মুসলিমার দুর্জয় জিহাদি সেনাবাহিনী খেলাফতে বনী উমাইয়ার যুগে ইসলামী খেলাফতের সীমান্ত পৌঁছে দেয় পৃথিবীর সকল মহাদেশে। অতঃপর মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন অংশ নানা আত্নকলহ ও নীতি ভ্রষ্টতার শিকার হওয়ায় কুফরী শক্তি তাদের উপরে আগ্রাসন চালিয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের ঐতিহাসিক বিপর্যয় সাধনে সক্ষম হয়। এর মধ্যে তাতারী আগ্রাসন ও ক্রুসেড যুদ্ধ অন্যতম। কিন্তু উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও না কোথাও ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের নিরাপত্তা বিধানে জিহাদ সমর্থক ইসলামী রাষ্ট্র বর্তমান ছিলো। ফলে উক্ত সময়ের আগ পর্যন্ত হায়েনা কুফুরী শক্তির সামনে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ জনহীন প্রান্তরে রাখালহীন বকরীপালের মতো চূড়ান্ত অসহায়ত্বের শিকার হয়নি। উনিশ শতকে সর্বশেষ জিহাদি ইসলামী রাষ্ট্র ছিল বর্তমান তুরস্ক। কিন্তু শেষের দিকে উহার শাসক শ্রেণী ইসলাম ও জিহাদ থেকে দূরে সরে শিরক-বিদআত, সৈরাচার ও পাপাচারের সয়লাবকে প্রশ্রয় দেয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ ও রুশ বাহিনীর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এ পরাজয়ের আগ পর্যন্ত বর্তমান মধ্য প্রাচ্যের সকল আরব রাষ্ট্র সহ ইউরোপ-এশিয়ার বহু দেশ তুর্কী সম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পরাজয়ের পরে এ মুমূর্ষু সম্রাজ্যের বর্তমান তুরস্ক ভূখন্ড বাদে বাকী সকল অঙ্গ শত্রুরা কেটে তাদের ইচ্ছামত ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল। অত:পর চরম ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ইসলাম সমর্থকের মুখোশ পরে ধূর্ত মুনাফিকি কৌশলে বর্তমান খন্ডিত তুরস্কের ক্ষমতায় আরোহন করে। অতঃপর সে কি কাজ করলো? এবার তার আসল চেহারা প্রকাশ পেলো। তুরস্ক হতে ইসলামকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে ইউরোপিয়ান ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা চালু করলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার গুরুজনদের তুলনায় আরো এক ধাপ আগে বেড়ে ইসলামী নিশানা মুছতে মুছতে হিজাব ও আজানে আরবী শব্দের ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ করলো। এভাবে এক সময়ের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের দুর্জয় অভিভাবক বিশাল তুর্কী ইসলামী রাষ্ট্রের শেষ স্পন্দন ঐ মুসলিম নামধারী নাস্তিকের হাতে থেমে গেলো। প্রতিষ্ঠিত হলো আজকের তথাকথিত আধুনিক তথা নাস্তিক্যবাদি তুরস্ক। এ হলো ১৯২৪ সালের ট্রাজেডি। এরপরে সমগ্র বিশ্ব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের নিরাপত্তা বিধানে জিহাদ সমর্থক ইসলামী রাষ্ট্র মুক্ত হয়ে পড়েছে। সেই হতে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ যে মানের দুঃখ দুর্দশা পতন ও অসহায়ত্বের শিকার, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের বিগত ইতিহাসে দুরবীন লগিয়ে তার নজীর মেলানো ভার। কারণ জিহাদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সমগ্র বিশ্বের কুফুরী শক্তি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়া হতে মুছে ফেলতে রাজনৈতিক, সামরিক, আধ্যাত্নিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিকসহ সকল দিক থেকে বাঁধ ভাঙা আগ্রাসন চালিয়ে দিয়েছে। এর মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহের কাছে না আছে উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি না আছে রাষ্ট্রীয় শক্তি। না আছে ধনবল, না আছে জনবল। আমার এ মন্তব্যে কেউ হয়তো অবাক হয়ে প্রশ্ন করবেন-কেনো? বর্তমান বিশ্বে ধনবল, জনবল ও সমর বলে পুষ্ট পঞ্চাশাধিক মুসলিম রাষ্ট্র থাকতে মুসলিম উম্মাহের ধনবল, জনবল, সমরবল নেই মানে?

এ প্রশ্নের নিশ্চিত নির্ভুল উত্তর হলো উল্লেখিত পঞ্চাশাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার সেনাবাহিনী ও সিংহভাগ জনগণ মুসলিম উম্মাহের কোন অংশ না। বরং তারা আত্নস্বীকৃত কাফির জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুনাফিকিচাল হিসেবে ওরা মুসলমান নাম ধারণ করলেও ওদের অন্তর, মন-মগজ ও সমগ্র দেহের শিরা-উপশিরা ইসলাম বিদ্বেষ ও কুফর প্রীতিতে টইটুম্বুর। এর অকাট্য প্রমাণ তাদের যাবতীয় শক্তি সামর্থ ইসলাম ও সত্যিকার মুসলিমদের সাহায্যে না বরং একমাত্র দমন-নিধনেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কুরআন-সুন্নাহের অকাট্য দালায়েল সমৃদ্ধ ফতুয়া মোতাবেক এরা সন্দেহাতীত মুরতাদ বা ইসলামত্যাগী কাফের। এ ফতুয়াদাতা আমি একা নই। বরং কুরআন-সুন্নাহ এর অভিজ্ঞ হাজারো সত্যাশ্রয়ী উলামার সর্বসম্মত ফতোয়া এটা।

যাই হোক আজকের বিশ্ব বাস্তবতা হলো মানবরচিত সকল শয়তানী-তাগূতি জীবনাদর্শের জন্য এ পৃথিবী উন্মুক্ত। ইউরোপিয়ান পশুবাদি সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত। রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র নামক তিন মানব শোষক স্বৈরতন্ত্র সমগ্র বিশ্বের শাসন ক্ষমতায় দোরদন্ড প্রতাপে অধিষ্ঠিত।

কিন্তু যে জীবনাদর্শের জন্য এ উন্মুক্ত পৃথিবী অতিসংকীর্ণ, যে তন্ত্র শাসন ক্ষমতার দিকে উঁকি মারা নিষিদ্ধ, যে জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গ তাগূতের নিষ্ঠুর কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, তা হল মানবতার মুক্তি কাণ্ডারী বিশ্ব স্রষ্টার রচিত শরীয়াত ইসলাম শুধু ইসলাম।

বাকি থাকল আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত সত্যিকার মুসলিম উম্মাহ। তাদের করুন কথা আর কি বলা? তাদের দুঃখ দুর্দশা অসহায়ত্ব ও সর্বনাশা আগ্রাসনের দাস্তান কোন ভাষায় ব্যক্ত করব? সে তো আমাদের চোখের সামনে। তাই কালক্ষেপন না করে সামনের দিকে যাই।

হে আমার মুসলিম কওম! আজ আমাদের ইসলাম ও আমরা কেন এই করুন দশার শিকার এবং এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের পথই বা কি? তা জানা ও বুঝার জন্য আমাদের নজর দিতে হবে আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের হাদিসের প্রতি। কেননা ‘অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম’ (সূরা মায়েদা, ৫:৩) বলে আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দান করেছেন। ফলে ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণতা এতটাই সমৃদ্ধ যে মানবজীবনের অতি সাধারণ বিষয়ের আহকাম ও কুরআন সুন্নাহে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের কি কারণে পতন আর কোন পথে উত্তরণ এমন বুনিয়াদি বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহে না থাকার প্রশ্নই আসে না। এমতাবস্থায় কুরআন-সুন্নাহ হতে নজর ফিরিয়ে পতনের কারণ ও মুক্তির পথ নির্ণয়ে কোনো ব্যক্তি রায়ের তোয়াক্কা করা একজন মুমিনের কাজ হতে পারে না। কারণ আল্লাহর নির্দেশ–

‘তোমরা আনুগত্য করো তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের প্রতি অবতারিত শরীয়াতের। উহার বিপরীত হরেক দোস্তের আনুগত্য করোনা। (সূরা আরাফ, ৭:৩)

> ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।’ (সূরা নূর, ২৪:৫৫)

‘আল্লাহ ও রাসুল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে পরে কোন মুমিন নর-নারীর অধিকার নেই নিজেদের তরফ হতে কোন রায় গ্রহণের। বস্তুত যে আল্লাহ ও তার রাসুলের নাফরমানী করবে সে প্রকাশ্য গোমরাহীর শিকার হবে।’ (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৬)

তাই সামনের দুটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে পতনের কারণ ও দ্বিতীয়টিতে উত্থানের উপায় সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহের দালায়েল সমর্থিত বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ পেশ করব ইনশা-আল্লাহ।

এ পর্যায়ে প্রথমত জানা দরকার যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের পতন দুই স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর হচ্ছে ইসলামী খিলাফত তথা ইসলামী শরীয়াহ আইনে পরিচালিত রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়া। এ হলো পতনের প্রথম ও প্রধান ধাপ। কারণ আল্লাহর পরে এ দুনিয়ায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের জন্য সর্বাধিক শক্তিশালী ও কার্যকর সংরক্ষক ও প্রতিপালক অভিভাবক একমাত্র ইসলামী খিলাফত।

এর দলীল নিম্নোক্ত আয়াত:

}

{

[:]

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।’ (সূরা নূর, ২৪:৫৫)

অত্র আয়াতে আল্লাহ খিলাফাতের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী এবং মুমিনদের নিরাপত্তা দানের ওয়াদা করেছেন। বিধায় খিলাফাতের অবর্তমানে ইসলাম ও মুমিনগণ দুর্বলতা ও বিপদগ্রস্থ হওয়া অবধারিত।

পতনের দ্বিতীয় স্তর হল খিলাফত অনুপস্থিতির সুযোগে ইসলামদ্রোহী তাগূতী শক্তি অভিভাবকহীন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে খতম করতে শতমুখী ভয়াল ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন ও আগ্রাসনের মাধ্যমে উহার বিনাশ সাধন করতে থাকা। পতনের এ উভয় স্তরে আজকের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ নিপতিত। তাই আসুন কুরআন-সুন্নাহে তালাশ করি এ সর্বনাশা পতনের কারণ।

সুতরাং প্রকাশ থাকে যে আল্লাহ ও রাসুল কুরআন-সুন্নাহে আমাদের জন্য পতনের যে সকল কারণ চিহ্নিত করেছেন, উহার একটি হল সামগ্রিক, যার মধ্যে পতনের সুনির্দিষ্ট ছোট বড় সকল কারণ অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে আমি ধারাবাহিকভাবে পতনের সামগ্রিক কারণ অত:পর এমন বড় বড় কারণগুলো বিশ্লেষণ করবো, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের পতন সাধনে যার ভূমিকা ও কার্যকারিতা ভয়ানক ও সুদূর প্রসারী। ক্ষুদ্র কারণগুলো সামগ্রিক কারণের অন্তর্গত ও বৃহৎ কারণগুলোর শাখা-প্রশাখা মাত্র। তাই সামগ্রিক কারণ ও বৃহৎ কারণগুলোর প্রতিকার সাধিত হলে ক্ষুদ্র কারণগুলো এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। বিধায় এ সীমিত লিপিকায় উহার বিস্তারিত অবতারণা এড়িয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করছি।

প্রথম কারণ: সামগ্রিক

অর্থাৎ, আল্লাহর গোলামী হতে দূরে সরে বেপরোয়া পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। দলীল এই–

'তোমাদের প্রতি যে বিপদ নিপতিত হয় উহা তোমাদের হস্ত কামাইয়ের (কৃত পাপের) প্রতিফল। তবে আল্লাহ অনেক গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন।' (সূরা শুরা, ৪২:৩০)। এ অর্থের আরো অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে যার মধ্যে বড় বড় গোনাহে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হওয়াকে আজাব আসার অন্যতম কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। পাপের কারণে দুনিয়াবী শাস্তি দেয়ার লক্ষ্য পাপীদের আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করা। যথা–

আমি অবশ্যই পাপীদের দুনিয়াবী শাস্তি আস্বাদন করাবো (আখিরাতের) মহাশাস্তির পূর্বে, যাতে তারা (আল্লাহর আনুগত্যের দিকে) ফিরে আসে।' (সূরা সাজদা, ৩২:২১)

তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জানা দরকার যে পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেয়াই বিপর্যয়ের শিকার হওয়ার একমাত্র কারণ না। কেননা ঈমান ও দ্বীনদারির পরীক্ষা নেয়ার জন্য এবং বিপদে সবরের প্রতিদান হিসেবে আখিরাতে উঁচু মর্তবা দান করার লক্ষ্যে ও আল্লাহ মুমিনদের মসিবতে ফেলার ঘোষণা কুরআন-সুন্নাহের বহু স্থানে প্রদত্ত হয়েছে। যথা–

( )

'মানুষেরা কি ভেবেছে যে- আমরা ঈমান আনলাম– বললেই তাদের কে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে না? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং (পরীক্ষার মাধ্যমে) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদীদেরকে আরো জানবেন মিথ্যুকদেরকে।' (সূরা আনকাবুত-২-৩)

.

.

আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান–মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদের যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (সূরা বাকারা, ২:১৫৫-১৫৭)

'সুতরাং নিরাপদ মুসলিমরা কুফরী শক্তি কর্তৃক নির্যাতিত মুসলিমদেরকে নিজেদের তুলনায় বেশি পাপী জ্ঞান করা এবং তাদের নির্যাতনকে তাদের পাপের ফল মনে করে তাদের সাহায্য হতে হাত গুটিয়ে রাখা এক ভয়ানক অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি বৈ কিছু না। কারণ কুরআনের প্রচুর আয়াতের ভাষ্য মোতাবেক যুগে যুগে কাফির কওম তাদের নবীর উপরে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। এমনকি তাদের অনেককে হত্যাও করেছে। যথা

'ইয়াহুদীরা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো।' (সূরা আল ইমরান, ৩:১১২)। নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য হতে দায় মুক্তি গ্রহণকারী ঐসব আয়েশী বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা– বনী আদমের সর্বোচ্চ মুত্তাকী সম্প্রদায় নবীগণ কোন মহাপাপ করেছিলেন? নবীকুল সর্দার মুহাম্মদ (সা.) ও মুহাজীর সাহাবাদের মক্কার মুশরিকগণ নিষ্ঠুর নির্যাতনে তাদের ভিটামাটি ছাড়তে বাধ্য করেছিলো। আপনারা কি বলবেন, এটা তাদের পাপের ফল? তাদের তুলনায় উচ্চতর মুমিন মুত্তাকি আর কারা হবে? কি কারণে তাদের উপরে আগ্রাসন চালিয়ে বহিষ্কার করা হয়েছিলো তা কুরআনের জবানে শুনুন–

'যাদেরকে তাদের জনপদ হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ।' (সূরা হজ্জ, ২২:৪০)

সুরা বুরুজে জনৈক কাফির রাজা কর্তৃক তার রাজ্যের নওমুসলিমদের বিশাল বিশাল অগ্নিখাদে ফেলে হত্যা করার করুন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কি অপরাধ ছিল তাদের? আল্লাহর ভাষ্যে শুনুন–

'তারা তাদের থেকে শুধু এ কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে যে তারা ঈমান রাখে পরাক্রান্ত প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি।' (সূরা বুরুজ , ৮৫:৮)

হযরত মুসা (আ.)ও ফিরাউনের জাদুকরদের মাঝে সংঘটিত

মোকাবিলায় যাদুকরগণ পরাস্ত হয়। মুসা (আ.)-এর সত্যতা বুঝতে পেরে ঈমান গ্রহণ পূর্বক সিজদায় লুটে পড়ল। ফিরাউন তাদের শুলে চড়িয়ে হত্যার ঘোষনা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করলো। কি কারণে? আল্লাহর সত্যায়িত জবাব শুনুন স্বয়ং জাদুকরদের জবানে।

'আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব, আমাদের পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদের মৃত্যু দান করুন।' (সূরা আরাফ, ৭:১২৬)

এই ধারার ঘটনা কুরআন-সুন্নাহে অনেক বর্নিত হয়েছে। উল্লেখিত দালায়েল থেকে প্রমাণিত হলো যে মুসলিম কওম আল্লাহর চরম নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া তাদের প্রতি শাস্তি আসার অন্যতম কারণ হলেও উহা বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ নয়। তাই নির্যাতিত মুসলিম কওম ও ব্যক্তি মাত্রই নিশ্চিত মহাপাপী ধারণা করার কোনো ভিত্তি কুরআন-হাদিসে নেই। মুসলিমের প্রতি এমন ভিত্তিহীন কুধারণা করা হারাম। দলীল এই–

'হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমানতো পাপ।' (সূরা হুজরাত, ৪৯:১২)

আল্লাহর রাসুল ফরমান–

.

( ) - 'তোমরা ভিত্তিহীন কুধারণা এড়িয়ে চলো। কারণ ভিত্তিহীন বদধারণা নিকৃষ্ট মিথ্যাচার।' (বুখারী ২৭৪৮)

মনে রাখা দরকার যে নির্যাতিত মুসলিম কওমকে অধিক পাপী আখ্যা দিয়ে তাদের থেকে সহমর্মিতা ও সাহায্যের হাত গুটিয়ে রাখা এক ভয়ানক শয়তানী চাল মাত্র, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। হাঁ, ইহা ভয়ানক শয়তানী চাল, কারণ–

১) উহার মাধ্যমে শয়তান নিরাপদ আয়েশি মুসলিমদেরকে তাদের অসহায় মজলুম মুসলিম ভাই বোনদের সাহায্য করার মহা ফরজ ত্যাগী বানিয়ে আয়েশী জীবনে ঘুমিয়ে রেখেছে। অথচ এতে তাদের মনে কোনো অনুতাপ নেই। কারণ তারা উক্ত খোঁড়া অজুহাতকে নিজেদের দায় মুক্তির যথেষ্ট সনদ মনে করেছে।

২) অপর দিকে উক্ত ভূয়া অজুহাতকে পুঁজি করে আয়েশীরা মজলুম মুসলিমদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে রাখায় অসহায়ত্ব দ্বিগুণ হয়েছে এবং আগ্রাসীরা প্রতিরোধ মুক্ত নির্বিঘ্ন আগ্রাসন চালানোর ফাঁকা ময়দান পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে শয়তান চক্র উহার অসামান্য সুবিধা ভোগ করছে। অতঃপর উক্ত অজুহাতটি বাচনিকভাবে শরয়ী লেবেলধারী হলেও শরীয়াতের সাথে উহার এতটুকু সম্পর্ক নেই। কারণ–

ক) মজলুম মুসলিমদের নাবালেগ শিশুরা ও অসহায় মাজলুম অথচ তাদের কোনো গোনাহ নেই।

খ) তাদের বালেগ নারী পুরুষের একাংশ দ্বীনদার মুত্তাকি। বরং এরাই মাজলুমদের সিংহভাগ। কারণ কাফিরের শত্রুতা মুসলিমের ব্যক্তির সাথে না বরং তার দ্বীনের সাথে। বিধায় রক্ষণশীল মুসলিমরাই তাদের চরম আক্রোশ ও আগ্রাসনের পাত্র। সুতরাং মহাপাপী হওয়ার পূর্বোক্ত অজুহাত অত্র দুই অংশের বেলায় মিথ্যা অপবাদ মাত্র।

গ) মজলুম মুসলিমদের বাকি অংশ মহাপাপী ঠিক কথা। কিন্তু তারা কুফুরির আগ্রাসন-নির্যাতন কবলিত হলে তাদের মুক্তি কল্পে সাহায্য করা আয়েশী মুসলিমদের দায়িত্বে জরুরী না, এ ফতুয়ার কোনো দলীল ইসলামী শরীয়াতে নেই। তবে এ ফতুয়া বাতিল হওয়ার প্রকাশ্য দলীল আল্লাহর কুরআনে রয়েছে। তা হলো আল্লাহ তার রসুলকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দানের পর হতে মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মদীনার বাইরের মুসলিমগণ মদীনায় হিজরত করা ফরজ ছিলো। এমন কি এ ফরজ ত্যাগের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ মদীনার সাহাবাদের তারা হিজরত করার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে সর্বাত্মক বন্ধুত্বের সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দ্বীনী স্বার্থে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে মাদানী সাহাবাদের কাছে সাহায্য কামনা করলে তাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দান করেছেন। আয়াতটি এই–

'নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনো বন্ধুত্ব নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোনো সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কওমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল করো, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।' (সূরা আনফাল, ৮:৭২)

সুতরাং আসুন নির্যাতিত অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের পাপের হিসাব না করে নিজেদের জিহাদ ত্যাগের পাপ হিসাব করি যে উহার ওজন ও গভীরতা কতদূর এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের সর্বনাশা পতন ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে উহার ভূমিকা কোন পর্যায়ের। কারণ আল্লাহর কাছে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলের হিসাব দিতেই দায়বদ্ধ। অন্যের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে না।

'তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।' (সূরা বাকারা, ২:১৩৪)। **(চলবে ইনশা-আল্লাহ...)**

-----ooooooooooooooooo-----

ইসলামের নামে এত দল, এতো মত। কোনটা সঠিক, কোনটা উত্তম কিভাবে জানা যাবে?

আব্দুর রহমান

...

( ) -

“এই দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের পক্ষে যুদ্ধ (ক্বিতাল) করবে”। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বরঃ ৫০৬২)

আমরা প্রায়ই এই কথাটা শুনি। সাধারণ লোকজন এমনকি ইসলামকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টারত অগ্রসর মুসলিমগণও এ রকম প্রশ্ন মাঝে মাঝে করে থাকেন। আসলেই কোনটা সঠিক দল, কোনটা আল্লাহর প্রিয় দল, তা জানতে আমাদের সবারই ইচ্ছা করে।

একটা শান্তনার কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা আল-কোরআনে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি হিদায়াত তথা সঠিক পথ চায়, তিনি অবশ্যই তাকে পথ দেখাবেন।

এছাড়া আল-কোরআনে বলিষ্ঠভাবে বার বার ঘোষণা হয়েছেঃ এটা মানব জাতির পথ-প্রদর্শক, এতে সব ব্যাপারে সমাধান আছে। সকল ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিবরণ না থাকলেও অন্ততঃ যে কোন ব্যাপারে আল-কোরআনে কিছু মূলনীতি দেয়া থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন–.

‘এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য’। (সূরা আল বাকারাঃ ২)

এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল-কোরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক অথচ সেখানে কোনো ইসলামী দল ভালো, মুসলিমগণ কোনো দলেকে বেছে নিবে - সে ব্যাপারে কোনো গাইডলাইন থাকবে না।

আলহামদুলিল্লাহ, এ ব্যাপারেও আল্লাহ আমাদের অন্ধকারে রেখে দেন নি। বরং সুস্পষ্টভাবে তার পছন্দনীয় দলের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন, যা দেখে মানুষ বুঝতে পারবে, কোন দল সত্য, কোন দল সঠিক পথে আছে, কোন দলকে মুসলিমদের সাপোর্ট করা উচিত, মুসলিম যুবকদের কোন দলে যোগদান করা উচিত। আল্লাহ বলেন–

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আল মায়িদাহঃ ৫৪)

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এখানে একদল মানুষ তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আরেক দল দ্বারা তাদেরকে পরিবর্তন করার কথা বলেছেন। অবশ্যই যে দলের মাধ্যমে আল্লাহ পূর্ববর্তী দলকে পরিবর্তন করবেন, সেটা অবশ্যই ভালো দল হবে এবং আল্লাহর প্রিয় দল হবে।

এখানে আল্লাহ তাঁর সেই প্রিয় দল বা সম্প্রদায়ের ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন–

ক) ঐ দলকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং ঐ দলও আল্লাহকে ভালোবাসবে।

খ) ঐ দল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবে, নম্র হবে।

গ) ঐ দল কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।

ঘ) ঐ দল আল্লাহর পথে জিহাদ করবে কোন তিরস্কারকারীর পরোয়া না করে।

চলুন একটু বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক।

প্রথমত ঐ দলকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং ঐ দলও আল্লাহকে ভালোবাসবে।

এই বৈশিষ্ট্য আসলে বাইরে থেকে বুঝা সম্ভব না। প্রত্যেক দলই দাবি করবে যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহও তাদের ভালোবাসেন।

দ্বিতীয়ত ঐ দল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবে, নম্র হবে।

মুমিনদের প্রতি বিনয়ী, নম্র মানেই হলো তাদের সাথে সুআচরণ করা, তাদের দুঃখে দুঃখী হওয়া, সুখে সুখী হওয়া। ঐ দল মুসলিম উম্মাহর সাথে একটি দেহের মতো হয়ে থাকবে।

এমন হবে না যে, ফিলিস্তিনে শত শত মুসলিম মারা যাচ্ছে, বার্মায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন হচ্ছে আর ঐ দল তখন তথাকথিত কোন ইস্যুর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, এ ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই। এমন হবে না যে, শত্রুরা বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল করে রেখেছে আর ঐ দলের এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য নেই। তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ঐ দল যে কোনো মুসলিম ভূমি দখল হলে ঐ ভূমি পুনরুদ্ধার করার ফরজ

জিহাদে শরীক হবে। অসহায়, নির্যাতিত মুসলিমদের রক্ষার জন্য জিহাদে বের হয়ে যাবে যেভাবে আল্লাহ আল কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। দেখুন সুরা নিসার ৪৫ নম্বর আয়াত।

এমন তো হয় না যে, আমরা আমাদের পিতামাতার প্রতি খুবই নম্র-কোমল কিন্তু কোন ডাকাত দল আমাদের পিতামাতাকে আক্রমণ করলো আর আমরা কিছু না করে বসে থাকি। যদি হাতের দ্বারা সামর্থ না থাকে তা হলে অন্তত আমরা মুখে চিৎকার করে আশেপাশের লোকজনকে ডাক দেই। এতটুকু না করলে তা আমাদের পিতামাতাকে সম্মান করা কিংবা তাদের সাথে নম্র ব্যবহার হবে না বরং ভণ্ডামী হবে। আর যদি আমরা নিজেরাই ঐ ডাকাত দলের সাথে আবার বন্ধুত্ব করি, তাহলে পরিস্থিতি কি হবে?

একই ভাবে, ভালো ইসলামী দল মুসলিম উম্মাহর প্রতি নমণীয় হবে। তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, সাহায্য করবে, শুধু নিজ দলের কিংবা নিজ দেশের মুসলিমদের প্রতি তাদের সহানুভূতি সীমাবদ্ধ রাখবে না। আর কখনো মুসলিম উম্মাহর সাথে যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করবে না, হৃদ্যতা রাখবে না। সেটাতো ঈমান বিধ্বংসী কুফর। আল্লাহ বলেছেন–

'সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।'

(সূরা আল মায়েদাহ:৫১)

তৃতীয়ত ঐ দল কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।

আল্লাহর রাসুল (সা.) এ সাহাবী (রা.) গণও এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ বলেন–

'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ও তার সাথীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াবান' (সূরা আল-ফাতহঃ ২৯)

এখন যদি কোনো ইসলামী দল কাফির দেশের রাষ্ট্রপতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রদূত দেখলে আহলাদে গলে যায়, হাত কচলিয়ে মুসাহেবের মতো তাদের সাথে কথা বলে, মুসলিমদের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ নেয়, সেটা কি কাফিরদের প্রতি কঠোরতা হলো?

যদি কোনো ইসলামী দল, নিজ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কাফির দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করে বলে, অমুক ব্যাপারে তার সাথে আমাদের অত্যন্ত সফল আলোচনা হয়েছে। তাহলে তো সে কাফিরদের প্রতি কঠোর হবার পরিবর্তে কাফিরদের প্রতি আকৃষ্ট হলো। তাদেরকে উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করলো। অথচ আল্লাহ বলেছেন–

'হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না'। (সুরা আল মায়িদাহঃ ৫১)

কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ.) এর কথায় যখন তিনি বলেছিলেন–

'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে'। (সূরা মুমতাহিনা :৪)

এখন যে সব দল কাফিরদের প্রতি কঠোর নয়, যারা কাফিরদের প্রতি নমনীয়, যারা মুসলিম বনাম কাফিরদের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে কথা বলতে পারে না, বরং যুদ্ধরত কাফিরদের সম্মান করে কথা বলে, তারা তো কোনভাবেই কাফিরদের প্রতি কঠোর নয়।

চতুর্থত ঐ দল আল্লাহর পথে জিহাদ করবে কোনো তিরস্কারকারীর পরোয়া না করে।

জিহাদের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা-সাধনা হলেও অন্যান্য ইবাদাতের মতো ইসলামে জিহাদেরও একটি সুনির্দিষ্ট রূপ আছে, তা হচ্ছে কাফিরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ যা বিভিন্ন মাজহাবের ফিকহের গ্রন্থগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। আর হাদিস গ্রন্থগুলিতেও জিহাদ অধ্যায়ে শুধু যুদ্ধের কথাই আছে, সেখানে দাওয়াতের জিহাদ, কলমের জিহাদ, নফসের জিহাদ কিংবা এরকম কোনো জিহাদের কথা নেই।

আর ফি সাবিলিল্লাহ বললে, সেক্ষেত্রে আরো নির্দিষ্টভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা বুঝা যায় বলেই সলফে সালেহীনরা উল্লেখ করেছেন।

তাই আল্লাহর সেই প্রিয় দল তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কিংবা মুসলিমদের ভূমি, মান-সম্মান রক্ষার জন্য জিহাদ করবে, কাফিরদের বিভিন্ন আগ্রাসন রুখে দেয়ার জন্য জিহাদ করবে। এবং এক্ষেত্রে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় তারা করবে না।

এখন যে সব দল কখনো জিহাদ করেনি, জিহাদের জন্য যাদের কোনো পরিকল্পনা নেই, পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে জিহাদের জন্য কোনো প্রস্তুতি নিতে ভয় পায় বরং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে দহরম-মহরম বজায় রাখে, তারা কখনো আল্লাহর প্রিয় ইসলামী দল হতে পারে না।

বরং আল্লাহর প্রিয় দল, ভালো ইসলামী দল আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকবে কোনো প্রকার তিরস্কারের পরোয়া না করে। একই ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেছেন–

...

( ) -

"এই দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের পক্ষে যুদ্ধ (ক্বিতাল) করবে"। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৫০৬২)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর পছন্দনীয় পথে চলার, সঠিক দলের সাথে থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

কুফরির পরিচিতি এবং মানুষ কেনো কুফরী করে?

শহীদুল ইসলাম

কুফরির পরিচিতি: কুফুরির শাব্দিক অর্থ হলো কোনো জিনিসকে গোপন করা, ঢেকে নেওয়া, অতএব এ ভিত্তিতে বলা হবে, যে ব্যক্তি কোনো জিনিসকে গোপন করলো সে ঐ জিনিসের কুফুরী করলো। আর এ শাব্দিক অর্থের উপরে ভিত্তি করেই পবিত্র কুরআনুল কারীমে কৃষককে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেহেতু সে ফসলের বীজকে মাটি দ্বারা গোপন করে। আল্লাহ (সুব.) বলেন–

'এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কাফেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়–কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সূরা হাদিদ, ৫৭:২০) অর্থাৎ উৎপন্ন ফসল কৃষককে আশ্চর্য করে এবং এ শাব্দিক অর্থের ওপর ভিত্তি করেই কাফিরকে কাফির বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ সে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহকে স্বীকৃতি জানানো থেকে গোপন করে এবং তা অস্বীকার করে। ইমাম আজহারী (রহ.) বলেন আল্লাহর তাআলার অন্যতম নিয়ামত হলো ঐ সকল নিদর্শন যা তার তাওহীদের (একত্ববাদের) ওপর বোঝায়। আর কাফির যেই নিয়ামত সমূহকে গোপন করেছে তা ঐসকল নিদর্শন যা দ্বারা একজন বিবেকমান ব্যক্তি এ কথা বুঝতে পারে যে, নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা এক ও একক এবং তার কোনো অংশীদার নেই। তদ্রুপ এ কথাও বুঝতে পারে যে, অলৌকিক নির্দেশনাবলি আসমানী কিতাব এবং সুস্পষ্ট দলীলসহ রাসুল প্রেরণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে স্পষ্ট নিয়ামত। অতএব যে ব্যক্তি এ সমস্ত নিয়ামতকে সত্যায়ন করে না এবং তা গোপন করে সে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কুফরী করলো। (লিসানুল আরব)

পারিভাষিক অর্থ: শরয়ী পরিভাষায় কুফর বলতে এমন জিনিষকে বুঝায়, যা ঈমানকে ধ্বংষ করে দেয় এবং এটি ঈমানের বিপরীতে ব্যবহার হয় অর্থাৎ কুফর হলো আল্লাহ তাআলা এবং তার নিয়ামত সমূহকে অস্বীকার করা।

কুফরের প্রকারভেদ: কুফর দুই প্রকার। ১) , ২) ।

(১) : (ছোট কুফুরী): কুফরে আজগর হলো এমন কুফর যা করার দ্বারা ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।যেমন তার থেকে ইসলামের গুণাবলি, ইসলামের বিধান এবং ইসলামের নিরাপত্তা বাতিল হবে না। এবং সে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার ওপর ন্যাস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা চাইলে এই কুফরে আসগরের কারণে তাকে শাস্তি দিবেন আর চাইলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তবে শাস্তি দিলেও তা কুফরে আকবার (বড় কুফর) কারী, যে কুফর করা অবস্থায় মারা গেছে, তার ন্যায় চিরস্থায়ীভাবে শাস্তি দিবেন না এবং সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে সুপারিশকারীদের সুপারিশ যাদের প্রতি সুপারিশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং অনুমতি দিবেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর এ প্রকার কুফুরীর ক্ষেত্রে , এবং পরিভাষাও ব্যবহার করা হয়। অতএব এ সমস্ত পরিভাষার ব্যবহারের বিধানের ক্ষেত্রেও কুফরে আজগরের বিধান প্রযোজ্য হবে, যা কর্তাকে ইসলাম হতে বের করে দেয় না। পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে কুফরে আসগরের উদাহরণ–

'যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বললো, 'আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব'। অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বললো, 'এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয়ই আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা'।' (সূরা নামল, ২৭:৪০) অতএব এখানে কুফর দ্বারা কুফরুন নি'অমাহ (নিয়ামতের কুফুরী) উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার কুফরী উদ্দেশ্য নয়। তদ্রুপভাবে ফিরআউন মুসা (আ.) কে সম্বোধন করে নিম্নের আয়াতে যে কুফুরীর কথা বলেছে এখানেও কুফরুন নি'অমাহ (নিয়ামতের কুফুরী) উদ্দেশ্য। যেমন কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ফিরআউন মুসা (আ.) কে বলেছিলো–

-

ফির'আউন বললো, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনি? আর তুমি তোমার জীবনের অনেক বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ'। 'আর তুমি তোমার কর্ম যা করার তা করেছ এবং তুমি কাফের (অকৃতজ্ঞদের) অন্তর্ভুক্ত'। (সূরা শুআরা, ২৬:১৮-১৯) অর্থাৎ আমার অনুগ্রহকে অস্বীকারকারী। রইসুল মুফাসসিরীন (মুফাসসিরীনদের ইমাম) ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অন্য মুফাসসিরীনগণ বলেন এবং এটাকে ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী (রহ.) গ্রহণ করেছেন যে, 'ত্বাগুতের সাথে এ ধরণের কুফরুন নি'অমাহ (অনুগ্রহের অস্বীকৃতি) কাম্য এবং পছন্দনীয়।'

অতএব আয়াতের মধ্যে কুফর শব্দটি কুফর বলেই ব্যক্ত করা হবে এবং এর দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। পারিভাষিক অর্থ যার কারণে কর্তা গুণাহগার হয় তা উদ্দেশ্য হবে না। হাদিস হতে কুফরে আসগরের উদাহরণ: (ক)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন যে, 'আমি জাহান্নামের মধ্যে যে সকল মহিলাদের তাদের অধিকাংশ মহিলারাই কুফরী করতো।' বলা হলো 'তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করতো?' রাসুল (সা.) বলেন, 'না। বরং তারা স্বামীর কুফুরী (অবাধ্যতা) করতো। এবং তাদের ওপর যতই এহসান (অনুগ্রহ) করা হতো তারা এহাসনকে কুফুরী (অস্বীকার) করতো।' (বুখারী :২৯) এখানে কুফুরী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ামত এবং অনুগ্রহের অস্বীকার করা। অতএব এটা কুফরুন দুনা কুফরীন যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। আর এ হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহ.) এবং

(স্বামীর অবাধ্যতা এবং ছোট কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না) শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এখানে ইমাম বুখারীর (রহ.) উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, যেমনিভাবে

(আনুগত্য) কে ঈমান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তদ্রুপভাবে

(অবাধ্যতা) কেও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে এটা হলো কুফরে আসগর। (ফাতহুল বারী : ৩/৩৪৪)। (খ)

'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী।' (বুখারী ৬০৪৪:মুসলিম:৩০, ২৩০) এখানেও কুফুরী দ্বারা কুফরে আসগর উদ্দেশ্য। গ):

রাসুল সাঃ বলেন, মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণী এমন রয়েছে যাদের সাথে কুফুরী মিলে রয়েছে। একজন হলো বংশ তিরষ্কারকারী অপরজন হলো মৃত ব্যক্তির উপর মাতমকারী। (সহীহ মুসলিম ২৩৬) ঘ)

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর হায়েজ (ঋতুস্রাবের) সময় তার সাথে সহবাস করল বা সাধারণ অবস্থায় তার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করল অথবা গণক যা বলে তা সত্যায়ন করলো তাহলে সে মুহাম্মদ (সা.) এর উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা কুফরী করলো। (মুসনাদে আহমাদ:১০১৬৭, তিরমিযি:১৩৫) * তাওস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ইবনে আব্বাস (রা.) কে যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, সে কি আমাকে এই বিষয়ে কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে? (অর্থাৎ এটি কুফরে আকবর নয় বরং কুফরে আসগর।) অতএব উল্লিখিত হাদিস সমূহে কুফর দ্বারা কুফরে আসগর উদ্দেশ্য হবে। (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন)।

(২) (বড় কুফরী): কুফরে আকবার হলো এমন কুফর যা কর্তাকে ইসলামের গুণাবলি এবং ইসলামের নামকরণ হতে নিষেধ করে অথবা তা এমন কুফর যা কর্তাকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয় এবং তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা ও সম্মান উঠিয়ে নেয়। এবং পৃথিবীতে তার ওপর কুফরীর বিধান কার্যকর হয় যদি সে ইতিপূর্বে কখনোই ঈমান না এনে থাকে। আর যদি ঈমান আনার পর এ ধরনের কুফর করে তার ওপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হয়। আর আখিরাতে তার প্রতিফল হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম যা কতই না নিকৃষ্টতম আবাসস্থল এবং সে কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত

> 'অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে 'নিশ্চয়ই মারইয়াম পুত্র মাসীহই আল্লাহ'। বলো, যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান মারইয়াম পুত্র মাসীহকে ও তার মাকে এবং জমীনে যারা আছে তাদের সকলকে 'তাহলে কে আল্লাহর বিপক্ষে কোনো কিছুর ক্ষমতা রাখে? আর আসমানসমূহ, জমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

-

হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কুফরে আকবার কখনো কখনো

(আক্বীদাগত কুফরী),

(স্পষ্ট কুফরী)ও বলা হয়। অতএব যখনই কুফরের ক্ষেত্রে এই পরিভাষা সমূহতে কোনো একটি ব্যবহার করা হবে তখন এর দ্বারা কুফরে আকবার উদ্দেশ্য হবে। পবিত্র কুরআনুল কারীম হতে কুফরে আকবারের উদাহরণ–

'যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিবো। অতঃপর তাকে আর তা কত মন্দ পরিণতি'। আগুনের আজাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব।' (সুরা বাকারা, ২:১২৬)

'অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে 'নিশ্চয় মারইয়াম পুত্র মাসীহই আল্লাহ'। বল, যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান মারইয়াম পুত্র মাসীহকে ও তার মাকে এবং জমীনে যারা আছে তাদের সকলকে 'তাহলে কে আল্লাহর বিপক্ষে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে? আর আসমানসমূহ, জমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (সুরা মায়েদা, ৫:১৭)

'অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন'। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে।' (সুরা মায়েদা, ৫:৭৩)

'আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (সুরা বাকার, ২:৩৯) এ ছাড়াও কুরআনুল কারীমে এজাতীয় কুফরী সম্বন্ধে অনেক আয়াত রয়েছে যার দ্বারা কুফরে আকবার উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হাদিস হতে কুফরে আকবারের উদাহরণ–

'উবাদা বিন সামেত (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে আহ্বান করলেন, অত:পর আমরা তার নিকট এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলাম যে, আমরা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, সহজ-কঠিন এবং স্বার্থপরতার ক্ষেত্রে তার কথা শুনবো, মানবে এবং আমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবো না। (রাসুল (সা.) বলেন) তবে যদি তোমরা তোমাদের মধ্যে কুফরে বাওয়াহ (স্পষ্ট কুফরি) দেখো যার ওপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (তা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে) স্পষ্ট দলিল রয়েছে।' (বুখারী:৭০৫৫ মুসলিম: ৪৮৭৭ বাইহাকী: ১৬৯৯৪ মেশকাত: ৩৬৬৬) এখানে কুফরে বাওয়াহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুফরে আকবার, যা কর্তাকে ইসলাম হতে বের করে দেয়।

মানুষ কুফুরী কেনো করে?

কুফরে আকবারের অনেক প্রকার রয়েছে। আর একথাও সবার জানা আছে যে, মানুষ যে কুফরী করে তা সবাই এক কারণে করেনা। নিন্মে কোনো শ্রেণীর মানুষ কোন কারণে কুফরী করে তাহলে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন কে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে তা পাঠকের বিবেকের উপর ন্যস্ত করা হলো, আশা করি পাঠকই বাস্তবতাকে তার সাথে মিলিয়ে নিবে ইনশাআল্লাহ ।(১)

(একগুয়েমী বশত কুফরী) কুফরুল ইনাদ বলা হয় যে ব্যক্তির কুফরী একগুয়েমির কারণে হয়। তবে এ ধরনের কুফরী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যকে চিনা, অন্তরে তার প্রতি বিশ্বাস রেখে হয়ে থাকে। কিন্তু একগুয়েমির কারণে তা গ্রহণ করে না এবং শাহাদাতকে মুখে উচ্চারণ করে না। যেমন আবু তালেব এবং এজাতীয় লোকদের কুফুরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে' (সুরা ক্বফ, ৫০:২৪

'কখনো নয়, নিশ্চয়ই সে ছিল আমার নিদর্শনাবলির বিরুদ্ধাচারী।' (সুরা মুদ্দাচ্ছির, ৭৪:১৬)

২) **(অস্বীকারবশত কুফর)** কুফরে ইনকার বলা হয় যে ব্যক্তির কুফরী মৌখিক এবং অন্তর

'আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করব। তারপর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (ওযর পেশের) অনুমতি দেয়া হবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদেরকে বলা হবে না।' (সুরা নাহল, ১৬:৮৪)

উভয়টা দ্বারা সৃষ্টিকর্তা, কিয়ামত, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদিকে অস্বীকার করে। যেমন ডারউইনসহ এ জাতীয় নাস্তিকমার্কা লোকদের কুফরী। কুফরে ইনকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন–

'আর স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করব। তারপর যারা কুফরী করেছে, তাদের (ওযর পেশের) অনুমতি দেয়া হবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদের বলা হবে না।' (সুরা নাহল, ১৬:৮৪)

৩) (অহঙ্কারবশত কুফরী)

কুফরী কাবীর এটা কুফরে ইনাদের মতোই। তবে পার্থক্য হলো এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির কুফরী এবং একগুয়েমির কারণ হলো তার অহংকার এবং বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। যেমন অভিশপ্ত ইবলিসের এবং তার অনুসারী রাষ্ট্র তাগূত যারা লক্ষ্য করে যদি তারা ইসলাম যথাযথভাবে গ্রহণ করে তাহলে দরিদ্র এবং দুর্বল মুসলিমদের সাথে একত্র হওয়ার কারণে তাদের সম্মান মর্যাদা কমে যাবে। ফলে তারা নিজেদের সম্মান উঁচু রাখার জন্য অহংকারবশত ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। যেমনটি ঘটেছিলো রাসুল (সা.) এর যুগে। তাহলো মক্কার নেতৃস্থানীয় কিছু লোক রাসুলের নিকট আসলো এবং তারা রাসুলের অণুসরণের জন্য দরিদ্র-দুর্বল মুমিনদের রাসুল (সা.) থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শর্ত করলো। যাতে করে দুর্বলদের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে তাদের সম্মান-মর্যাদা কমে না যায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব.) বলেন–

'আর আমি তো মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার নই'। (সুরা শুআরা, ২৬:১১৪)

অহংকার বশত কুফরীর ক্ষেত্রে আরো ইরশাদ হচ্ছে–

'আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। তখন তারা সিজদা করলো, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করলো এবং অহঙ্কার করলো। আর সে হল কাফিরদের অন্ত র্ভুক্ত।' (সুরা বাকারা, ২:৩৪)

ফিরআউনের অহঙ্কারের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

'আর কারূন, ফির'আউন ও হামানকে (আমি ধ্বংস করেছি) এবং অবশ্যই তাদের কাছে মুসা গিয়েছিল প্রমাণাদিসহ। অতঃপর তারা জমীনে অহংকার করেছিলো; এতদ্সত্ত্বেও তারা (আমার আজাব) এড়াতে পারেনি।' (সুরা আনকাবুত, ২৯:৩৯)

'হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' (সুরা যুমার, ৩৯:৫৯)

'আর আমি নিশ্চয়ই মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রাসুল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি 'পবিত্র আত্মা' (জিবরাইল আ.) এর মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসুল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ।' (সুরা বাকারা, ২:৮৭)

}

'পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদের তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ দেবেন এবং তার অনুগ্রহে তাদের বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহঙ্কার করেছে, তিনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।' (সুরা নিসা, ৪:১৭৩)

এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনুল কারীমের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কুফরে কিবিরকে বুঝায়। হাদিস থেকে উদাহরণ–

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তির অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। না।' (সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ২৮০ মসলিম:২৭৫)

আর এ হাদিসের অর্থ এবং কুফরীর সঙ্গার ক্ষেত্রে এসেছে তাহলো, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সৃষ্টিজীবকে অপদস্থ করা। (শরহুল বুখারী লিইবনিল বত্তাল, ফাতহুল বারী, মেরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ)

(৪). (বিরোধিতাবশত কুফর) : কুফরে জুহুদ হলো, অন্তর দ্বারা সত্যকে চিনা এবং সত্যায়ন সত্তেও মৌখিক এবং আমলগতভাবে তার বিরোধিতা করা। যেমন ইয়াহুদি এবং জাতীয় লোকদের কুফরী। যেমন ইয়াহুদিরা অন্তর দ্বারা মুহাম্মদ (সা:)কে চিনা এবং অন্তর সত্যায়নের পরে মৌখিকভাবে তার বিরোধিতা করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্ত-ানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে।' (সূরা বাক্বারা ২:১৪৬)

আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করলো। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল ।(সূরা নামল ২৭:১৪)

তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা লুকমান ৩১:৩২)

আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। অতএব, আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদের) কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান রাখে। আর কাফিররা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না। (আনকাবুত ২৯:৪৭)

আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আলাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এলো, আর তারা (এর মাধ্যমে) পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এলো যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের ওপর আল্লাহর লা'নত। (সূরা বাকারা ২:৮৯)

(৫). (দ্বিমুখীতাবশত কুফর) : কুফরে নিফাক হলো, বাহ্যিকভাবে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরকে কুফরীর ওপর স্থীর রাখা। যেমন মুনাফিক এবং এজাতীয় লোকদের কুফরী। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন−

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা নিসা ৪:১৪৫)

আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ি আজাব। (সূরা তাওবা ৯:৬৮) **(৬).**

(মিথ্যাপতিপন্ন এবং হারামকে হালাল করণবশত কুফর) : কুফরে তাকজিব হলো, আল্লাহর (সুব.) শরীয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যেমন : আল্লাহ (সুব.) বলেন,

বরং কাফিররা অস্বীকার করে। (সূরা ইনশিকাক ৮৪:২২)

বরং কাফিররা মিথ্যারোপে লিপ্ত। (সূরা বুরুজ ৮৫:১৯)

আর কুফরে ইসতিহলাল হলো, শরীয়ত যেসমস্ত জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে সেগুলোর থেকে কোনটিকে হালাল বলে ঘোষণা দেওয়া। আর এ ধরনের কাজ তার কুফরীর বিপরীত নয়, কেননা সে নিজে আল্লাহর বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং নিজেকে আল্লাহর অংশীদার সাবস্ত্য করে তার মতো সে ও বিধান তৈরি করেছে। যেমনঃ আল্লাহ (সুব:) বলেন,

তোমরা লড়াই করো আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়। (সূরা তাওবা ৯:২৯) **(৭)**

(অপছন্দতা ও ঘৃণাবশত কুফর) : কুফরে কুরহ এবং বুগদ হলো, অপছন্দতা ও ঘৃণাবশত শরীয়তের বিধানকে পিছনে ছুড়ে মারা। যেমন আল্লাহ (সুব.) বলেন−

আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৮-৯)

এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, 'অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো'। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৬)

(৮). (দোষারোপ এবং উপহাসবশত কুফর): কুফরে ত্বয়ান হলো, শরীয়ত কর্তৃক কোন বিধানকে দোষারোপ করা। কাজেই এটি কুফরে কুরহ এবং বুগদ হতে আরো মারাত্নক। যেমন আল্লাহ (সুব.) বলেন−

আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, নিশ্চয়ই তাদের কোনো

কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়। (তাওবা ৯:১২)

আর কুফরে ইসতিহজা হলো, শরীয়তের কোনো বিষয় বা রাসুল (সা.) কে নিয়ে উপহাস, ব্যাঙ্গ, ঠাট্টা করা। যেমন আল্লাহ (সুব.) বলেন–

আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করো, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলো, 'আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসুলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আজাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী। (তাওবা ৯:১২)

আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী। (তাওবা ৯:১২)

আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী। (সূরা নিসা ৪:১৪০)

(৯) (প্রত্যাখ্যান এবং উপেক্ষাবশত কুফ্‌র) : কুফরে ইবা এবং ইরাদ হলো, শরীয়তের বিধানকে সুস্পষ্টভাবে জানার পরও তা থেকে বিমুখ হয়ে প্রত্যাখ্যান, উপেক্ষা করা। যেমন আল্লাহ (সুব.) বলেন–

আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? নিশ্চয়ই আমি তাদের অন্তরসমূহের ওপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদের হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:৫৭)

পূর্বে যা ঘটে গেছে তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি। তা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এটা তাদের জন্য বোঝা হিসেবে কতই না মন্দ হবে! (সূরা ত্বহা ২০:৯৯-১০১)

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। (সূরা ত্বহা ২০:১২৪)

বি:দ্রঃ কুফরুল ইরাদ দুই ধরনের হয়ে থাকে। (ক) শরীয়তের শাখাগত বিষয় প্রত্যাখ্যান করা। তবে এর কারণে সাধারণত সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়না। (খ) শরীয়তের বিধানকে সার্বিকভাবে বা তাওহীদ এবং তার ওপর আমল করা থেকে বিমুখতা পোষণ করে তা প্রত্যাখান করা। আর এসকল অবস্থাতেই স্বাভাবিকভাবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

(সম্মানিত শাইখ আবু বাসীর আত্-তরতসী কর্তৃক কাওয়ায়েদ ফিত তাকফীর হতে সংকলন)

-----oooooooooooooooooo-----
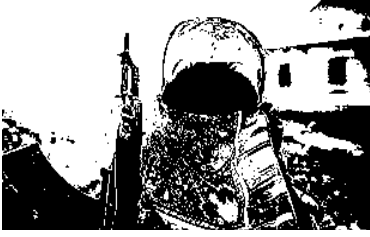
বীর নারী

তামান্না আক্তার রাবেয়া

ছায়ামূর্তি

তখনো ভোর হয়নি পুরোপুরি। ফজরের সময় চলছে। আবছা আঁধারের শরীরে শরীর মিশিয়ে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তিটি। চুপি চুপি বেড়ালের মতো পা ফেলে, সাবধানি ভঙ্গিতে। তার এই সীমিত নড়াচড়াও ধরা পড়ে গেলো একজনের চোখের কোণে। আব্দুল মুত্তালিবের কণ্যা ছফিয়্যাহ (রা.) আবছা আলো-আঁধারির মাঝে দেখতে পেলেন ছায়ামূর্তিটিকে।
কে এই ছায়ামূর্তি?
কেনো ঘোরাঘুরি করছে সে?
দুর্গের আশ-পাশে কি কাজ তার?
প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খেতে থাকলো ছাফিয়্যাহর (রা.) মনে।

যুদ্ধযাত্রা

খন্দকের যুদ্ধ আসন্ন। যুদ্ধের ঘনঘটা চারদিকে। পুরুষ সাহাবাদের নিয়ে হুজুর (সা.) চলে যাবেন খন্দকে। যুদ্ধের ময়দানে শুধু নারী ও শিশুরা রয়ে যাবে মদিনায়। মদিনায় তাদের রেখে যাওয়া কি নিরাপদ হবে?
যখন মুসলিম পুরুষরা কেউ থাকবে না মদিনায়?

যখন বনি কুরাইযা করেছে বিশ্বাস ঘাতকতা? আর ওরা কুরাইশদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মিত্র সেজে? যদি ওরা আক্রমণ করে বসে মুসলিম নারীদের ওপর?
কোমলমতি নিস্পাপ শিশুদের ওপর?
কে সামাল দেবে এই বিপর্যয়?
ভাবছেন হুজুর (সা.)
পেরেশানির একখণ্ড মেঘ এসে বারবার আঁধার করে দিচ্ছিলো তার চাঁদোজ্জল মুখটি।
ভাবতে ভাবতে সমাধানও পেয়ে গেলেন আল্লাহর কৃপায়। উম্মাহাতুল মুমিনিন, ফুফু ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন কবি হাসসান বিন সাবিতের (রা.) দুর্গে। হাসসান (রা.) এটি পেয়েছিলেন ওয়ারিশ সূত্রে। মদিনার সব চেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ এটাই। ওদের দুর্গে রেখে পরম প্রশান্তি অনুভব করলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের নিয়ে চললেন খন্দক অভিমুখে।

মিটিং

গভির রাত।
বনি কুরাইযার ইয়াহুদিরা মিটিংয়ে বসেছে। নেতৃস্থানীয়রা বসেছে প্রথম সারিতে বসেছে। নেতৃস্থানীয়রা বসেছে প্রথম সারিতে। দ্বিতীয় সারিতে বসেছে সাধারণ ইয়াহুদিরা। সকলের চোখে মুখেই অস্থিরতা, ক্রোধের ছায়া। পরিবেশটা থমথমে। নড়ে চড়ে বসলো এক ইয়াহুদি নেতা, উসখুস করতে করতে হাত উঁচিয়ে বলতে লাগলো–
'আজ আমাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।' থামলো সে।
'সেটা কিভাবে?'
পেছনের সারি থেকে একজন বলে উঠলো'
'আমরা কুরাইশকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবো। এতেই মুহাম্মাদ (সা.) পরাজিত হবে। ওদের নারী ও শিশুদের হত্যা করে ফেলবো, দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে।'
ব্যাখ্যা করলো আরেক ইয়াহুদি নেতা।
'কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) যদি নবী ও শিশুদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে গিয়ে থাকেন? ওদের নিরাপত্তার জন্য যদি রেখে গিয়ে থাকেন পুরুষদের? বিষয়টি কি আমাদের যাচাই করে নেয়া উচিত নয়? পরামর্শ দিল একজন।
'অবশ্যই যাচাই করে নেয়া উচিত' সমস্বরে বলে উঠলো কয়েকজন ইয়াহুদি।

মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো– একজন গুপ্তচর রাতের আঁধারে গিয়ে খবর নিয়ে আসবে– 'দুর্গে কোনো পুরুষ আছে কি না।' কে যাবে, কারা যাবে, ঠিক করে দেয়া হলো সেটাও। এরপর মুহাম্মাদ (সা.) এর ধ্বংস কামনা করে মিটিংয়ের সমাপ্তি টানলো ইয়াহুদিরা।

গুপ্তচরের দল

শেষরাত।
আকাশে কয়েকটি তারা উঁকি ঝুঁকি মেরে আছে। চাঁদের নিস্প্রভ আলোয় জমাট বাঁধা আঁধার পুরোপুরি দূর হয়নি। আবছা আলো আঁধারির খেলা চলছে মদিনার অলিতে গলিতে।
আবছা আলো আঁধারির কালো চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো ইয়াহুদি গুপ্তচরের দল। পা চালিয়ে হাটতে থাকলো ওরা গুর্গের দিকে। দূর থেকে অন্ধকার একটি চূড়া দেখা যেতেই একজন বলে উঠলো–
'ঐ তো! দেখা যাচ্ছে দূর্গের চূড়া।'
সমতল জায়গা থেকে অনেক উঁচুতে দূর্গটি। গোড়ায় একটু আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো গুপ্তচরের দলটি। নেতা গোছের একজন বললো ফিসফিস করে– 'যাও। সাবধানে ঘুরে দেখো, তারপর রিপোর্ট করো আমাদের। আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।'
দাঁড়িয়ে থাকা গুপ্তচরদের থেকে পৃথক হয়ে গেলো একজন। কালো চাদরে শরীর মুড়িয়ে সঙ্গিদের থেকে হারিয়ে গেলো সে। সতর্ক পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো কাঙ্খিত স্থানে। কান পাতলো দুর্গের প্রাচিরের গায়। প্রথমে অনেক্ষণ শুনতে পেলো না কিছুই। তবু কান পেতে রাখলো ধৈর্য ধরে।

ভোরের অভিযান

ভোররাত।
ছাফিয়্যাহর (রা.) ঘুম ভেঙে যায়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। চুলগুলো বিন্যস্ত করে বেঁধে নিলেন। মাথায় উড়না জড়িয়ে বেরুলেন কামরা থেকে। পানির মশক রাখা আছে দুর্গের পশ্চিম কোণে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। কিসের যেনো একটা নড়াচড়া ধরা পড়লো চোখের কোণে।
নজর রাখার গোপন ছোট্ট জানালাটি দিয়ে তাকালেন বাইরে। দৃশ্য দেখে স্থির হয়ে গেলেন তিনি– দুর্গপ্রাচীর ঘেঁষে হেঁটে আসছে একটি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ প্রাচীরের গায় কান পাততে দেখলেন তাকে।
কে সে?

কী শুনতে চায় কান পেতে?
ভাবতে ভাবতে ভোরের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো সব।
বুঝে ফেললেন তিনি– ছায়ামূর্তিটি নিশ্চয়ই ইয়াহুদি গুপ্তচর। দুর্গের ভেতরের খবর নিতে এসেছে। কোনো পুরুষ আছে কি না, নাকি ভেতরে শুধু নারী আর শিশুরাই?
বিপদ টের পেয়ে ঘেমে গেলেন তিনি। অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো তার মনে। মনে মনে ভাবলেন– 'রাসুল্লাহ (সা.) রয়েছেন খন্দকে। কুরাইশদের মুখোমুখি। বিশ্বাসঘাতক বনি কুরাইযা যদি বুঝতে পারে কোনো পুরুষ নেই আমাদের মাঝে, নিশ্চয়ই আক্রমণ করে বসবে। আমাদের নারীরা হবে বন্দি আর শিশুরা হবে দাসদাসী।' ভেবে শিউরে উঠলেন তিনি। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন– 'কিছু একটা করতেই হবে।'

মৃত্যু

ছাফিয়্যাহ (রা.) ওড়না খুলে ফেললেন। সেটা জড়িয়ে নিলেন মাথায়। কোমরে গামছা বেঁধে নিলেন শক্ত করে। হাতে তুলে নিলেন লোহার বড় হাতুড়ি। চুপি চুপি নেমে আসলেন দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে। ধীরে আর সাবধানে ছিদ্র করলেন দুর্গপ্রাচীরে। ছিদ্র দিয়ে তাকালেন অপর পাশে, হু– দেখা যাচ্ছে গুপ্তচর ছয়ামূর্তিটিকে ঠাণ্ডা মাথায় নিরিক্ষণ করতে লাগলেন তিনি।
সে খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করছে দুর্গের ভেতরের অবস্থা। অন্য দিকে কোনো খেয়াল নেই তার। ছাফিয়্যাহ (রা.) দুর্গফটক খুললেন সতর্ক হাতে। বেরিয়ে আসলেন বাইরে। ধীর পদক্ষেপে বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালেন ছায়ামূর্তিটির পেছনে। ধীরে ধীরে হাতুড়ি উঠালেন তার মাথা বরাবর। তারপর সেটা নামিয়ে আনলেন চোখের পলকে। আঘাত সইতে না পেরে পড়ে গেলো ছায়ামূর্তিটি। ধপাস করে শব্দ হলো একটা। বিরতি না দিয়ে আরো দুটি আঘাত করলেন তিনি।
জীবনপ্রদীপ নিমিষেই নিভে গেলো ছায়ামূর্তিটির।

পলায়ন

গুপ্তচর সঙ্গির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ইয়াহুদিরা অস্থির হয়ে উঠলো–
'ব্যাপার কি?
আসছে না কেনো?
ফিরতে এত সময় কেনো লাগছে?
দূর্গচূড়ায় দিকে তাকিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে ওরা।
'আরে, সেতো কোন সংকেতও দিচ্ছে না?
তবে কী ধরা খেয়ে গেলো?'

হঠাৎ একজন বলে উঠলো–
'ঐটা কি?
ঢাল বেয়ে নেমে আসছে কী ওটা?'
তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাকালো অন্যরাও। কুণ্ডুলি পাকানো মস্তকবিহীন নিথর একটা দেহ নেমে আসছে প্রাচীরের ঢাল বেয়ে। গড়াতে গড়াতে সেটা থামলো এসে ওদের পায়ের কাছে। ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সব। বন্ধুটির লাশ দেখে ওরা চমকি গিয়ে থমকে গেলো। বলে উঠলো–
'হায় দুর্ভাগ্য! মুহাম্মদ আসলেই সচেতন। চলো সবাই ভাগি। নইলে আমাদের পরিণতিও হবে ওর মতো।
ভয়ে কাবু হয়ে গেলো ওরা।
অস্থিরতা দেখা দিলো ওদের ভেতর।
চেহারা হয়ে গেলো ফ্যাকাসে। তারপর নেড়ি কুত্তার মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলো ওরা।

ভোররাত।
ছাফিয়্যাহর (রা.) ঘুম ভেঙে যায়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন বিছানায়। চুলগুলো বিন্যস্ত করে বেঁধে নিলেন। মাথায় উড়না জড়িয়ে বেরুলেন কামরা থেকে। পানির মশক রাখা আছে দুর্গের পশ্চিম কোণে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। কিসের যেনো একটা নড়াচড়া ধরা পড়লো চোখের কোণে।
নজর রাখার গোপন ছোট্ট জানালাটি দিয়ে তাকালেন বাইরে। দৃশ্য দেখে স্থির হয়ে গেলেন তিনি– দুর্গপ্রাচীর ঘেষে হেঁটে আসছে একটি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ প্রাচীরের গায় কান পাততে দেখলেন তাকে।
কে সে?
কী শুনতে চায় কান পেতে?
ভাবতে ভাবতে ভোরের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো সব।
বুঝে ফেললেন তিনি– ছায়ামূর্তিটি নিশ্চয়ই ইয়াহুদি গুপ্তচর। দুর্গের ভেতরের খবর নিতে এসেছে। কোনো পুরুষ আছে কি না, নাকি ভেতরে শুধু নারী আর শিশুরাই?
বিপদ টের পেয়ে ঘেমে গেলেন তিনি। অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো তার মনে। মনে মনে ভাবলেন– 'রাসুল্লাহ (সা.) রয়েছেন খন্দকে। কুররাইশদের মুখোমুখি। বিশ্বাসঘাতক বনি কুরাইযা যদি বুঝতে পারে কোনো পুরুষ নেই আমাদের মাঝে, নিশ্চয়ই আক্রমণ করে বসবে। আমাদের নারীরা হবে বন্দি আর শিশুরা হবে দাসদাসী।' ভেবে শিউরে উঠলেন তিনি। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন– 'কিছু একটা করতেই হবে।'

আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন?

কল্পনা করুন, এক মুসলিম রাষ্ট্রকে কিভাবে শাসক গোষ্ঠীরা, মুরতাদরা যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে, মুসলমান দেশগুলোকে শাসন করছে। তারা এমন ভান ধরে, যেনো আসলেই তারা মুসলমানদের জন্য উদ্বিগ্ন। মুসলমানদের আলেমগণদের, যারা সেই দেশের মুসলমানরা বিশ্বাস করে, পথ প্রদর্শক হিসেবে মান্য করে, অথচ তারাই (আলেমগণরা) ভান ধরে থাকে এবং বাস্তবে সেই দেশের মুসলমানদের জন্য কোনো কাজ করছে না। চিন্তা করুন, মুসলমান সামরিক সৈন্যরাই মুসলমানদের সুরক্ষার কাজে নেয়। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং নিজ আত্মা দ্বারা জালিম শাসকদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করাই হচ্ছে এদের মূল পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য। যে মুসলমানরা ইসলাম শরিয়াহ আইন 'একটি পূর্ণ জীবন বিধান' প্রতিষ্ঠিত করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায় এবং এর মাধ্যমে সকল নিষ্ঠুরতা, নির্যাতনের অবসান যারা ঘটাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেই সামরিক সেনা গোষ্ঠীরা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। চিন্তা করুন, আজকে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু তারা এই শরিয়াহর বিরোধিতা করে, এবং মানব রচিত আইন সমর্থন করে, যার মূল উদ্ভাবন হচ্ছে অমুসলিমরা (কাফেররা)। যারা তাদের এই পার্থিব বিধিবিধান এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতা শক্তি প্রয়োগ করে পুরো বিশ্বকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়, যারা পুরো বিশ্বকে নিজেদের শাসনে খাটাতে চায়! চিন্তা করুন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসে, যারা শুধু সত্য এবং ন্যায়ের জন্য অসত্যকে ও অন্যায়কে দূরীভূত করার জন্য যুদ্ধের আহ্বান জানায়, শুধু তাদের বিরুদ্ধেই এই দেশ এবং শাসক গোষ্ঠীগুলো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারপর এরা কারারুদ্ধ করে হাজারও-মিলিয়ন মুসলমানদের, তাদের উপর নির্যাতন করে, এবং সারা বিশ্ববাসীর কাছে তাদের 'সন্ত্রাসী' নামে আখ্যায়িত করে, সারা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠরাই তাদের অসত্যটাকে বিশ্বাস করে, তাদের সমর্থন করে।
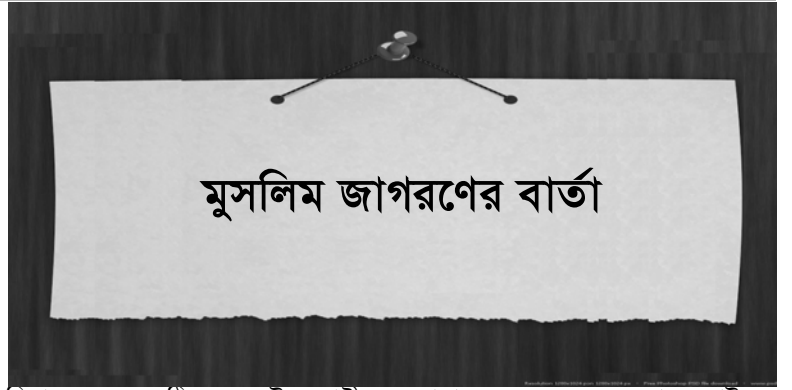
চিন্তা করুন, ঠিক একই শ্রেণীর মানুষেরাই সারা বিশ্বের মিডিয়া উৎস, ম্যাগাজিন, টিভি, আউটলেট, অধিকতর ইন্টারনেট ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র, সাংবাদিক দ্বারা পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছে। কেনো? যাতে তাদের এই মিথ্যা, রটানো প্রচারণার মাধ্যমগুলিই সারা বিশ্ববাসীর কাছে একমাত্র মূল উৎস হয়ে থাকুক এবং তাই যেনো কেবল তারা দেখে, শুনে এবং তাতেই মনোনিবেশ করে। চিন্তা করুন, ঠিক একই ক্ষমতার মানুষেরাই রয়েছে প্রধান সহযোগী হিসেবে, বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদও যেমন– জ্বালানি সঞ্চয়, বিশ্ব খাদ্য সরবরাহ, সব কিছুর আয়ত্ব তারা নিয়েছে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে। চিন্তা করুন, আবার সেই একই শ্রেণীর ক্ষমতাবানদের মনে একটিই মূল লক্ষ্য। তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার ওপর যারা বিশ্বাসী তাদেরকে ধ্বংস করা, যাতে কোনো এক আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তিও জীবিত না থেকে থাকে। এবং পুরোপুরিভাবে সত্যকে নিশ্চিহ্ন করাই সক্ষম হতে পারে। খেয়াল করুন, সকল প্রকারের ইন্টেলিজেন্স সংগঠন 'সিআইএ, এফবিআই, কেজিবি', গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা একেকটি পুলিশ সংগঠন, আরবের পুলিশ, এবং সকল গোপনীয় অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সংযুক্তটা রয়েছে বিশ্বের একটিমাত্র গোপনীয় সংগঠনের সাথে এবং এর সম্পৃক্ততায় থেকে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা যুদ্ধ করছে ইসলামের বিরুদ্ধে।

কল্পনা করুন, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কত গোপনীয় কারাগার, যা কেউই জানে না এবং তা আমাদের সুন্দর মুসলমান ভাই ও বোনেদের উপস্থিতিতে ভরপুর। কেনো? কারণ তারা শাসক গোষ্ঠীদের (সরকার) বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো ও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা ছিল সত্যিকারের আলেম যাদের ইসলামের ওপর ছিল বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান। যারা অন্যদের থেকে ইসলামকে বুঝেছিলো পরিপূর্ণভাবে। এবং বৃদ্ধরা যারা পুরোপুরিই নির্দোষ তাদের বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং যারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের ওপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন সইতে না পেরে, পরিবার বাঁচাতে পালটা প্রতিবাদ অথবা আক্রমণ করতে ঔদ্ধত হয়েছে, তাদেরকে এই সব গোপন কারাগারে নিয়ে গিয়ে, তাদের শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। কেউ জানে না এই সব তথ্য অথবা আসলেই কি এ কারাগার গুলো বিদ্যমান, জানেনা তারা এই গোপন কারালয়ের অবস্থান সম্পর্কে। কোন অভিযোগ বা অপরাধ ছাড়াই তাদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। কি কারণে? তারা শুধু একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করতো।

কল্পনা করুন, একটি দেশের হাজারও মুসলিম পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদেরকে একটি জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা একজন আরেকজনের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা। এবং তাদের বলা হয়েছে, তাদেরকে নিজেদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে যেখানে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করবে। এই আশায় তারা সবাই উৎসুক এবং সবচেয়ে বেশি খুশি যে তারা নিজেদের বাসস্থানে ফিরে

চলেছে। কিন্তু তাদের সবার হাত শেকল দিয়ে বাঁধা এবং এই শেকলটির সাথে সংযুক্ত করা রয়েছে নৌকার ভারী নঙ্গরটি। নোঙরটি জাহাজের এক কিনারাই চলে গেলো, এখন সে নোঙরটিই অনবরত সেই শেকলে বাঁধা মানুষদের পানির দিকে ঠেলতে লাগলো, এবং এক পর্যায়ে তাদের সবাইকে মহাসাগরের ঠাণ্ডা শীতল বরফ পানির গভীরে নিয়ে যেতে থাকলো। শেষপর্যন্ত ভারী নোঙরটি জাহাজ থেকে কেটে বিচ্চুত করে দেওয়া হলো, তারা গভীরে ডুবে শ্বাসত্যাগ করলো। জাহাজটির মোড় ঘুরে গেলো এবং আবারও নিজ গন্তব্যে ফিরে আসতে লাগলো। এমনভাবে যেনো কিছুই ঘটেনি এবং কর্মকাণ্ডটির সাথে জড়িতরা ছাড়া এই ব্যাপারে কেউই জানতে পারলো না, অবগত হলো না।

চিন্তা করুন, পুরো বিশ্বের গোপন ইন্টেলিজেন্স সংগঠন, পুলিশ বাহিনী, শাসক, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী তারা সবাই এক শত্রুর অধীনেই ঐক্যবদ্ধ এবং তারা তাদের (শত্রুপক্ষকে) অবগত করে না যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হচ্ছে। তারা বরঞ্চ তাদের সাথে বন্ধুত্বস্বরূপ আচরণ করে এবং দাবি জানায় তারা খুব অল্পসংখ্যকদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। শত্রুরা এই অসত্যকে বিশ্বাস করে চারদিকে এটির প্রচারণা চালিয়ে গভীর নিদ্রায় গেলো। তাদের নিজেদের জীবন কতোটা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন তারা সেই বিষয়কে আর গ্রাহ্য করলো না এবং অসচেতনই রয়ে গেলো।

যারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চায়, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে চলতে চায়, চিন্তা করুন তাদের বিরুদ্ধে ঠিক একই শ্রেণীর দেশগুলো, শাসক গোষ্ঠীরা, এবং গোপনে বিভিন্ন সমাজ রাত দিন ধরে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে কামিয়াব হবে। তারা সবাই একাগ্রতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং দাজ্জালের আগমন সুগম করছে, সে আসবে এবং সারা বিশ্বে একাই রাজত্ব করবে। অধিকাংশরা তাকে পূজা করবে, তার কথায় উঠাবসা করবে, যা তাদেরকে সারাজীবনের জন্য জাহান্নামের আগুনের দিকেই ধাবিত করবে। চিন্তা করুন, একটিমাত্র 'কিতাব' যা প্রত্যেক ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে কিতাবে আপনার অবগতির জন্য জীবনে আপনার সফল্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, এবং যা কখনোই আপনাকে ধোঁকা দিবেনা, যার (কিতাব) মাধ্যমে আপনি পরিপূর্ণভাবেই বাস্তব উপলব্ধি করতে পারবেন, সতর্ক থাকবেন। এই 'কিতাব' নিয়ে আগমণ করেছিলো এক 'সুপুরুষ', যিনি নিজেই সবকিছুর বিচার বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, এই পৃথিবীতে সফলতা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হতে হলে আপনার করণীয়তা সম্পর্কে। সবাই জানে এই 'কিতাবটি' সম্বন্ধে এবং যারা এটিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে, তাদেরকেই 'সন্ত্রাসী' ও 'চরমপন্থী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পুরো বিশ্বই তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ঘুরে দাঁড়ায়।

দৃশ্যমান যে, এই মানুষদের বিজয়ের কোনো সুযোগই নাই। বলতে চাচ্ছিলাম, আপনি যদি এই বিষয়টি চিন্তা করেন, যে মুসলমানদের কোনো সুযোগই নেই এবং এই বিজয় তাদের পক্ষে যে করেই হোক এটি অর্জন করা অসম্ভব। এখন আপনি আবারো উপলব্ধি করুন, মুসলমানদের পক্ষে কেউ নেই শুধু একজন ছাড়া, শুধু মাত্র একজন ছাড়া! তাদের পক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন! নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন! একমাত্র তাঁর ওপর বিশ্বাস করা এবং সকল প্রকারের পাপ এবং অবাধ্যতা হতে দূরে অবস্থানে থাকাই তাদের একটিমাত্র অস্ত্র!

এবং এই সকল কর্মকাণ্ড কি সিংহাসনের উপরে হচ্ছে না সিংহাসনের নিচে? এ সবই সিংহাসনের নিচে। এর মানে, মহান আল্লাহ সবার উপরে রয়েছেন! বিজয় নিশ্চিত এবং তা অবশ্যই আমাদের!

এই আহ্বান আপনাদের প্রত্যেকের জাগরণের জন্য।

এই পৃথিবী এবং যে সময়ের মধ্যে আমরা বসবাস করছি, আপনি যদি এর মধ্যে থেকেই উপলব্ধি করে না থাকেন, তাহলে হয়তোবা আপনি এখনো ঘুমন্ত রয়েছেন অথবা আপনার চিন্তা শক্তিই পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। কোরআনের দিকে ফিরে আসুন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটি মোতাবেক পূর্ণ জীবনযাপন করুন। দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতাকে ভুলে যান। আমরা অল্প ক্ষণিকের জন্য এই দুনিয়ার মুসাফির, খুব শীঘ্রই এই দুনিয়াকে ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। সুতরাং এই জীবনটিকে বিলাসিতায় উৎসর্গ করবেন না। সদৃশটি ও স্বচ্ছভাবে লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং শক্তি সঞ্চারণ করুন। ইসলামকে জাগরণ এবং উম্মাহদের সহযোগিতার জন্য যতটুকু আপনার সামর্থ্যে রয়েছে আপনি ততটুকুই করুন। কেবল ২টি মাত্র স্থানেই আমাদের শেষ কেন্দ্রস্থল, আমাদের অবসান। সুতরাং ভেবে দেখি, কোন দুইটির একটিতে আমরা অবতরণ করতে ইচ্ছুক?

পিছে তাকানো চলবে না, এখন থেকে আপনি পূর্ণ এক যথার্থ মুসলমান। আগেকার 'গোনাহগার' ব্যক্তিকে (নিজেকে) ভুলে যান এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শক্তির সাথে ইসলামের দিকে ফিরে আসুন। নিজেকে নতুনভাবে পুণর্জাগরণ করুন, এই নতুন আত্মাটিই এখন আপনি নিজে!

এখন থেকে আপনি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না, এবং এখন আপনার একমাত্র লক্ষ্য পরকাল এবং এটিই আপনার একমাত্র জ্বালানি যা আপনার সহায়ক হবে আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ের মাধ্যমে। আপনি যদি আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে বিজয় করেন, মহান আল্লাহ তায়ালা নিজে আপনাকে বিজয় দান করবেন। বার্তাটি আপনাদের জন্য! জেগে উঠুন আপনারা! সময় অতিবাহিত এবং বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আপনারা জেগে উঠুন!

এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। আপনি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন?

ওয়েব হতে সংগৃহীত
Ansar Al Islam English Website

attibyean jan 2013

Posted on January 20, 2013

মাসিক আত তিবইয়ান

ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: attibyean.tk

মাসিক আত তিবইয়ান-এ

আপনার লিখা পাঠান: attibyean@gmail.com

প্রাপ্তি স্থান:

১. হাসান কম্পিউটার

টাউন হল, বরগুনা

মোবাইল: ০১৯১৫৯৮৯৬৬০

২. মুহাম্মদ ফিরোজ

চৌরাস্তা, গাজীপুর

মোবাইল: ০১৯৩৪৯০৭১৪২

অভিযোগ ও পরামর্শ

আত তিবইয়ান-এ
আপনার লেখা পাঠাতে
ইমেইল করুন
attibyean@gmail.com